অনন্য একক

আড়াই দশক আগে চলে গেছেন মানুষটি। কিন্তু আজও কী অমোঘ তাঁর উপস্থিতি! সময় এতটুকু বিবর্ণ করতে পারেনি তাঁকে। জীবনমুখী জোয়ার কিংবা বিশ্বায়নের ঘূর্ণির মধ্যেও অটল দাঁড়িয়ে এক মহীরুহ। কী মন্ত্রে, কোন জাদুতে - তারই উত্তর খুঁজেছেন শ্যামল চক্রবর্তী।

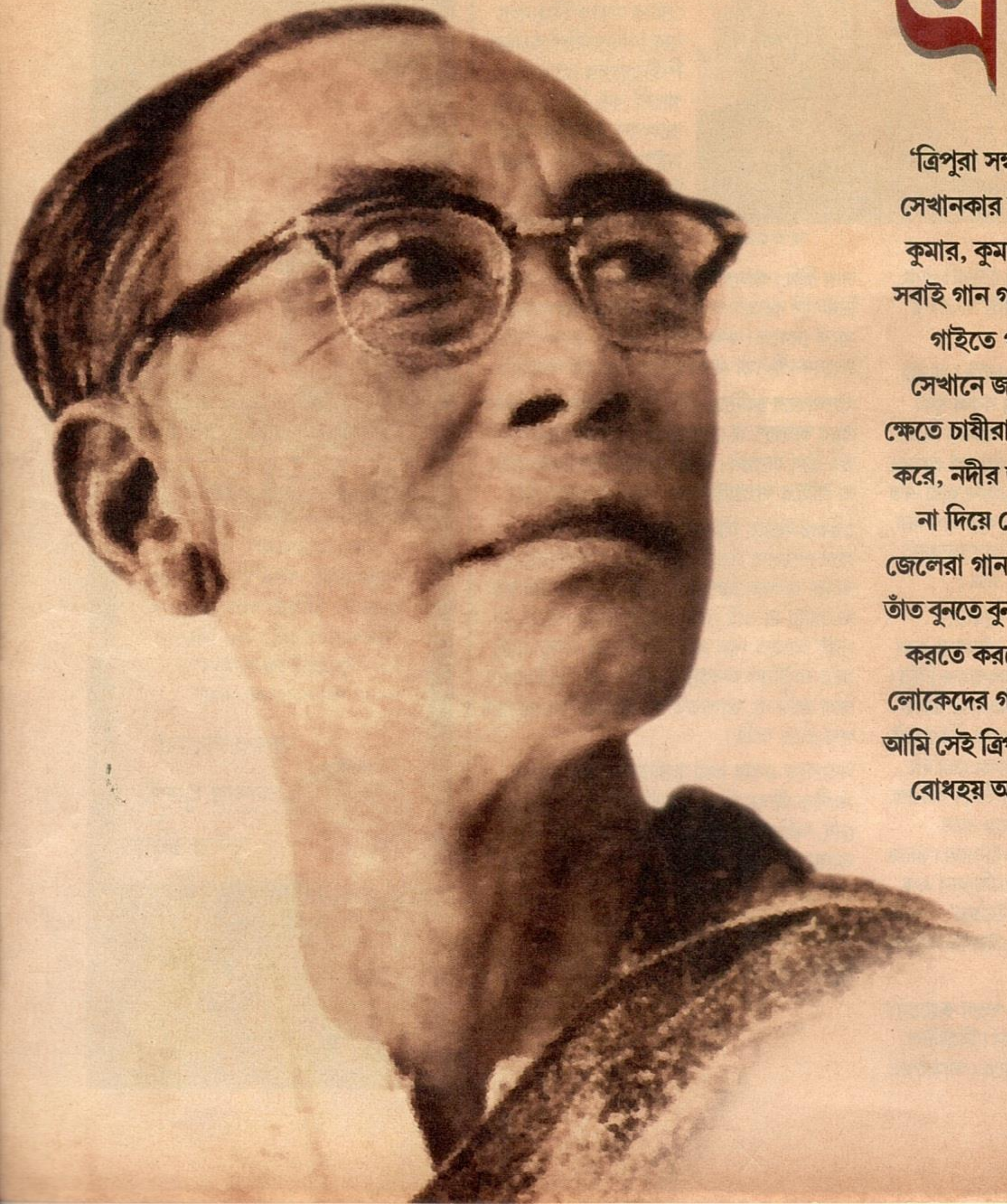

'ত্রিপুরা সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে, সেখানকার রাজবাড়িতে রাজা, রানী, কুমার, কুমারী থেকে দাসদাসী পর্যন্ত সবাই গান গায়। গলায় সুর নেই, গান গাইতে পারে না এমন কেউ নাকি সেখানে জন্মায় না। ত্রিপুরার ধানের ক্ষেতে চাষীরা গান গাইতে গাইতে চাষ করে, নদীর জলে মাঝিরা গানের টান না দিয়ে নৌকো চালাতে জানে না, জেলেরা গান গেয়ে মাছ ধরে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে আর মজুরেরা পরিশ্রম করতে করতে গান গায়। সেখানকার লোকেদের গানের গলা ভগবানপ্রদত্ত। আমি সেই ত্রিপুরার মাটির মানুষ— তাই বোধহয় আমার জীবনটাও শুধু গান গেয়ে কেটে গেল।'

বাংলা জনম দিলা আমারে

১৯০৬ — ১৯২৪

গানপাগল বাঙালির 'শচীনকর্তা'। ত্রিপুরা রাজপরিবারের 'শচীনকুমার'। ফিল্মি দুনিয়ার 'এস ডি'। এছাড়া আরও একটি নাম ছিল তাঁর, ডালিমকুমার। ধাই-মার দেওয়া নাম। ফর্সা টুকটুকে ডালিমপানা ছেলে কি না! রাজপরিবারের প্রথামতো প্রত্যেক ছেলেমেয়ের ধাত্রী ছিল আলাদা আলাদা। শচীনকুমারের ধাত্রীকে সবাই ডাকত 'রবির মা'। বড্ড অভিমান হত ছোট্ট শচীনের। 'কেন? আমি বুঝি ছেলে নই?' জীবনকথায় শচীন দেববর্মণ লিখছেন—

'২৪ ঘন্টা তিনি আমাকে স্নেহের আঁচলে ঢেকে রাখতেন। জ্ঞান অবধি তাঁর হাতেই স্নান খাওয়া শোওয়া সব কিছু। কলেজ জীবনেও বাড়ি থেকে যখন বাইরে যেতাম, আমার পথ চেয়ে বসে থাকতেন। দেরী হলে বকুনি শুনতে হত। পরে যখন কলকাতাতে স্থায়ীভাবে এসে বাস করছি, ধাই-মাও আমার সঙ্গে কলকাতা এসেছিলেন, কারণ আমাকে না দেখে তিনি থাকতে পারতেন না।'

এ-ই হচ্ছেন শচীনকর্তা। খ্যাতির শিখরে পৌঁছে পরিণত বয়সে যখন 'সরগমের নিখাদ' লিখছেন, তখনও কী মমতায় স্মরণ করেছেন ধাত্রীমাকে। জল মাটি হাওয়ার মতো এও যে এক অপরিশোধ্য ঋণ!

ফেরা যাকউৎসে। ত্রিপুরার রাজা ঈশানচন্দ্রমানিক্যের ছিল দুই ছেলে। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র আর নবদ্বীপচন্দ্র। প্রথামতো নবদ্বীপচন্দ্রের রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ঈশানচন্দ্রের পর রাজা

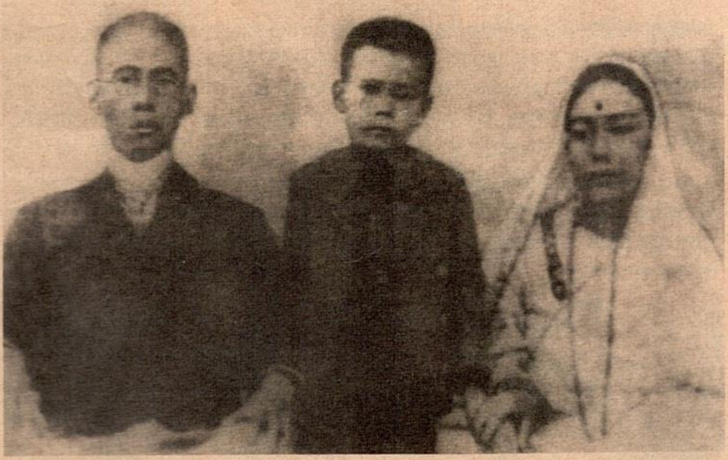

বাবা-মার সঙ্গে ছোট্ট শচীনকুমার

হলেন ছোটভাই বীরচন্দ্র। অবিভক্ত বাংলায় তখন কুমিল্লা জেলা ছিল ত্রিপুরার অধীন। নবদ্বীপচন্দ্র রাজবাড়ি ছেড়ে কুমিল্লায় বাড়ি করে চলে যান। নানুয়া দিঘির পাড়ে ষাট বিঘা জমির ওপর তাঁর বাড়ি ছিল। নবদ্বীপচন্দ্রের পাঁচ ছেলে, চার মেয়ে। সবচেয়ে ছোট ছেলে শচীনকুমার। ১৯০৬ এর ১ অক্টোবর কুমিল্লার বাড়িতে তাঁর জন্ম। মা নিরুপমা দেবী মণিপুর রাজপরিবারের মেয়ে।

ছেলেবেলা থেকেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে শচীনকুমারের আন্তরিক মেলামেশা রাজবাড়ির সদস্যদের না-পসন্দ ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল না নবদ্বীপচন্দ্রের। আগরতলা শহরে তখন 'কুমার বোর্ডিং' ছিল। সাধারণ বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে রাজবাড়ির ছেলেরাও সেখানে থেকে লেখাপড়া করত। শচীনকুমার কিছুদিন ছিলেন সেখানে।

একদিন নবদ্বীপচন্দ্র হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, একই অপরাধে মাস্টারমশাই সাধারণ ছেলেদের যে শাস্তি দিচ্ছেন, রাজবাড়ির ছেলেদের তা দিচ্ছেন না। প্রমাদ গুনলেন তিনি। এখানে থাকলে তো ছেলে মানুষ হবে না! বোর্ডিং থেকে তুলে নিয়ে নিজের কাছে রেখে ছেলেকে মানুষ করবেন ঠিক করলেন। প্রথমে কিছুদিন কুমিল্লার ইউসুফ স্কুলে পড়ে ক্লাস ফাইভে শচীনকুমার ভর্তি হলেন জেলা স্কুলে। প্রথম বছরেই স্কুলের সরস্বতী পুজোয় বাবার শেখানো গান গেয়ে সকলের মন জয় করে নিলেন।

'বাবাই ছিলেন শচীনকর্তার প্রথম শিক্ষাগুরু। তিনি লিখছেন, আমি আমার পিতৃদেবের ধাঁচে গড়া, তাঁর শিক্ষাই আমার মেরুদন্ড। তাঁর দীক্ষাতেই আমার এই সামান্য কলাবিদ্যার স্ফূরণ ঘটেছিল। ..... খুবই নিপুণ হস্তে সেতার বাজাতেন আর তাছাড়া চমৎকার গলা ছিল তাঁর ধ্রুপদাঙ্গ গানের।'

শচীনের গানের প্রতি আগ্রহ দেখে নবদ্বীপচন্দ্র ভাবলেন, গানটা সত্যি সত্যি গাইতে গেলে

মনে পড়ে

রাইচাঁদ বড়াল

শচীনকর্তার গান প্রথম শুনেছিলাম বোধহয় কলকাতা বেতার কেন্দ্রে। গান শুনে অবাক হয়েছিলাম। বেগম আখতার যেমন হিন্দি গজল এবং দাদরা গানের জগতে বৈচিত্র এনেছিলেন গলা ভেঙে ভেঙে গান গেয়ে, ঠিক তেমনি শচীন দেববর্মণও পল্লীগীতির ক্ষেত্রে ওই ধরণের বৈচিত্র এনেছিলেন।

বোধহয় ১৯৪০-৪১ সাল, নিউ টকীজ কর্তৃপক্ষ 'নারী' নাম একটি ছবি প্রযোজনা করেছিলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন প্রফুল্ল রায়। আর প্রফুল্লদা ওই ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাকে। ওই ছবিতে একটা গান গাইবার জন্যে আমি শচীনকর্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। গানটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শুনতে শুনতে প্রতিটি দর্শক চোখের জল ফেলেছিল। গানটি হল — 'কে যেন কাঁদিছে আকাশ ভুবনময়, হায় ধরণী'র লাঞ্ছিতা মেয়ে, একি তোর পরাজয়!'

আজ এতদিন পরেও যখন শুনি তখন তন্ময় হয়ে ভাবি—
'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি।'

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

শচীন আমার কাছে এবং আমার গুরু বাদল খাঁর কাছে বেশ কিছুদিন তালিম নিয়েছিল। তালিম নেবার সময় তার নিষ্ঠা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে নিষ্ঠার সঙ্গে সংগীতসাধনা করে গেছে।

আমি যখন কয়েকটি ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তখন শচীনকে আমার সহকারী হিসেবে নিয়েছিলাম। আমার সুর দেওয়া কয়েকটা ছবিতে সে গানও গেয়েছে। পরবর্তীকালে শচীন নিজেও সংগীতপরিচালক হয়েছে।

বম্বেতে কয়েকটি ছবির গানে খুব লঘু ধরনের সুর ব্যবহার করাতে কয়েকজন এসে আমাকে তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাল। বলল, 'শচীন এটা কি করছে!'

আমি শুনে বললাম, ওর এক্সপেরিমেন্ট এতদিনে সার্থক হয়েছে। সব সময় জানবে, ছবির মিউজিক বা গান ঘটনার পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। কোনও ক্যাবারে নাচের মিউজিক হিসেবে যদি কোন সংগীত পরিচালক সরোদ বা জয়জয়ন্তী রাগ ব্যবহার করেন, তবে কি কোনও দর্শক সেটা সহ্য করতে পারবে?

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা। ১৯৪৯ সালের শেষাশেষি। একদিন 'বিদুষী ভার্যা' ছবির একটা গান রেকর্ড করে বাড়ি এসে একটু বিশ্রাম করছি। শুনলাম মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের ভাগ্নে শচীন গাঙ্গুলি এসেছেন। শচীন গাঙ্গুলি বললেন, 'শচীন দেববর্মণ তোমাকে খুঁজছেন। বম্বে নিয়ে যেতে চান। ওঁর ছবিতে তুমি গাইবে।' আমার বড়দা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বললেন, 'ওর এখানে অনেক কাজ। এ সময়ে বম্বে যাওয়ার তো একটু অসুবিধে।' শচীন গাঙ্গুলি আমাকে বললেন, 'মীরা বউদি তোমার গান শুনতে চেয়েছেন। দেখো কী করবে?'

শচীনদার বাড়ি ছিল দক্ষিণ কলকাতার সাউথএন্ড পার্কে। একদিন দাদার সঙ্গে সাউথএন্ড পার্কের বাড়িতে গিয়ে মীরা বউদিকে গান শুনিয়ে এলাম। তিনি আমার গান শুনে খুব খুশি। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। শেষ পর্যন্ত আমার বম্বে যাওয়া স্থির হল। দাদা বললেন, 'শচীনদা যখন ডেকেছেন, যত অসুবিধেই হোক আমাদের যাওয়া উচিত।'

১৯৫০ সাল। আমার আজও মনে আছে বর্ষাকালে প্রথম বম্বে গিয়েছিলাম।

বম্বেতে শচীনদা আমাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল রেলস্টেশনের গায়ে 'এভারগ্রীন' হোটেলে। শচীনদা এত স্নেহশীল ছিলেন, প্রতিদিন একবার করে আমার ঘরে এসে খোঁজখবর নিয়ে যেতেন। আমি ঠিকমতো প্র্যাকটিস করছি কিনা, আমার খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে কি না ইত্যাদি সব ব্যাপারেই তীক্ষ্ণ নজর ছিল তাঁর।

শচীন দেববর্মণকে আমি আগে থেকে চিনতাম। তখন আমি ছেলেমানুষ। তেরো চোদ্দ বছর হবে। দক্ষিণ কলকাতার বিজলী সিনেমা হলে এক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে শচীনদাও এসেছিলেন। শচীনদা গাইবেন। তাঁর গান শোনার জন্য এত ভিড় হয়েছিল কী বলব। সেই সময় তিনি হায়েস্ট পেড সিঙ্গার। তখনকার প্রত্যেকটা ফাংশনে একশ টাকা করে নিতেন।

আমি যখন গাইতে যাচ্ছি শচীনদা আয়োজকদের বললেন, 'এত ছোট মেয়ে। তোমরা ভাল করে কিছু পেতে ওর বসার ব্যবস্থা করে দাও। ডায়াসে এমনি বসলে ওর ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' তখন শীতকাল ছিল। পরে বাড়িতে ফিরে মেজদা আমাকে বলেছিলেন, 'তুই, যখন গাইতে বসবি, শচীনদা আমাকে বললেন, চাদরের ওপর আমার গায়ের শালটা পেতে দাও, মেয়েটা খানিকটা আরাম পাবে। আমি আপত্তি করলাম।' মেজদার কাছ থেকে একথা শোনার পর শচীন দেববর্মণের এক অন্য রূপ আমি খুঁজে পেলাম। সেই মুহূর্ত থেকে তিনি শুধু প্রতিভাবান, শ্রদ্ধেয় এক সংগীতশিল্পী ও সুরকার নন, আমার কাছে কোমল মনের বিনয়ী এক মানুষ।

ছবি ঃ ধীরেন দেব

সঠিকভাবে তালিম নেওয়া দরকার। শ্যামাচরণ দত্ত তখন কুমিল্লায় ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক ছিলেন। শচীন তাঁর কাছে তালিম নিক — এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু ছেলে নারাজ। শাস্ত্রীয়সংগীত শচীনকর্তার ভালো লাগত না, এমন নয়। বড় হয়ে শাস্ত্রীয়সংগীতচর্চায় যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। কিন্তু ছোটবেলায় তাঁর বাউল মন ঘুরে বেড়াত মাঠে ঘাটে, গ্রামের পথে পথে। ব্রাত্যজনেরাই ছিল তাঁর দোসর —

'মাধব নামে আমাদের এক বৃদ্ধ চাকর ছিল। রবিবারে স্কুল ছুটির দিনে খাওয়া দাওয়ার পর মাধব আমাদের সুর করে রামায়ণ পড়ে শোনাত। সে যখন সুরে রামায়ণ পড়ত, তখন তার তান খট্‌কী ছাড়া সরল সোজা গানের ধরণ আমাকে পাগল করে দিত। আমাদের বাড়িতে বাউল ভাটিয়ালি গাইয়ে, গাজন গান ও কালীনাচের গাইয়ে, ফকির, বোষ্টম দূরের গ্রাম থেকে আসত। তাদের গানে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম।

আমাদের বাড়িতে আনোয়ার নামে আরেক ভৃত্য ছিল। আনোয়ার ছিল আমার মাছধরা শেখানোর গুরু। আনোয়ার রাত্রে তার দোতারা বাজিয়ে যখন ভাটিয়ালি গান করত, তখন আমার ব্যাকরণ মুখস্থ করার দফা রফা হয়ে যেত। পরদিন স্কুলে মাস্টারমশাইয়ের কাছে বকুনিও খেতাম। কিন্তু রাত্রে আবার ব্যাকরণ মুখস্থ, অঙ্ক কষা ছেড়ে আনোয়ারের কোল ঘেঁষে বসে তার ভাটিয়ালির সুরে ও কথায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। এরাই হল, লোক সংগীতে আমার প্রথম দুই গুরু।'

১৯২০। শচীনকুমার কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ-তে ভর্তি হলেন ভিক্টোরিয়া কলেজে। বিষয় সাহিত্য। কিন্তু পড়ায় মন বসে না। ছেলেবেলার আগ্রহ ধীরে ধীরে নেশা হয়ে উঠছে। কোথাও গানবাজনা হচ্ছে জানতে পারলে কিশোর শচীন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না।

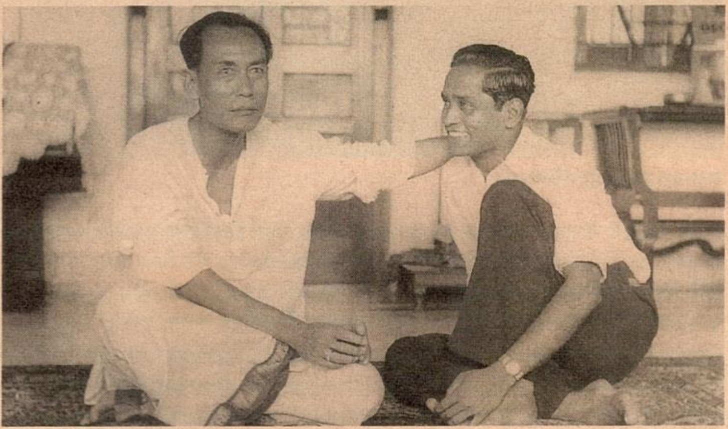

ফুটবল খেলোয়াড় বেঙ্কটেশের সঙ্গে — ছবি ঃ ধীরেন দেব

গানের নেশায় ছুটে বেড়ালেও দু'বছর পর ভালভাবেই আই. এ. পাশ করলেন। এবার ইচ্ছে কলকাতায় গিয়ে বি. এ. পড়বেন। কিন্তু নবদ্বীপচন্দ্র রাজি হলেন না। অতএব ভিক্টোরিয়া কলেজেই বি. এ.-তে ভর্তি হলেন। এই সময়ের স্মৃতিচারণায় শচীনকর্তা লিখছেন — পূর্ববঙ্গের ওই অঞ্চলের এমন কোন গ্রাম নেই বা এমন কোন নদী নেই, যেখানে আমি না ঘুরেছি। ছুটি ও পড়াশোনার ফাঁকে আমি গান সংগ্রহ করতাম। সে সম্পদের জোরে আমি সুরের সেবা করে চলেছি — তার আদি হল আমার ওইসব দিনের সংগ্রহ।

১৯২৪। ত্রিপুরার রাজপরিবারের প্রথম স্নাতক হলেন শচীনকুমার। এবার উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁকে কুমিল্লার বাইরে যেতেই হবে। নবদ্বীপচন্দ্র নিজে ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে এম. এ-তে ভর্তি হলেন শচীনকুমার।

মা পুতের এই বাঁধন ছেঁড়ার সাধ্য কারও নাই

১৯২৫ — ১৯৪৪

সংস্কৃতির পীঠস্থান মহানগর কলকাতা। প্রতিভার যোগ্য সমাদর দিতে জানে এই শহর। একথা জেনে, এক বুক আশা নিয়ে এখানে ছুটে এসেছেন শচীনকর্তা। কিন্তু প্রথম দর্শনেই মনটা গেল দমে। ইট কাঠ সিমেন্ট কংক্রিটের রাজত্বে আকাশ কই? বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার মত বাতাস! মাটি জল হাওয়ার মানুষ শচীনকুমার কলকাতায় মাটি বিক্রি হতে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। মনটা হাহাকার করত বাড়ির জন্য। বিশাল বাড়ির চৌহাদ্দিতে তিনটে দিঘি। তার পাড়ে ঘুরে ঘুরে গান গাওয়া, বাঁশি বাজানো। টিপরাই বাঁশি। তার মজাই আলাদা।.....

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ত্রিপুরা প্যালেস-এ থাকেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ক্লাস, লাইব্রেরির পড়াশুনো শেষ হতে হতে সন্ধে গড়িয়ে যায়। তারপরই আস্তানায় ঢুকে পড়া। এই নিয়মবাঁধা জীবনে দমবন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর। ভাল লাগছে না লেখাপড়া। গান শিখতে চান। .... কিন্তু কার কাছে শিখবেন? ইতিমধ্যে একজনের গান তাঁকে মুগ্ধ করল। তিনি, কৃষ্ণচন্দ্র দে। সুরের মূর্ছনা আর অনন্য গায়কিতে লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে আবিষ্ট করে দিতে পারেন এই মানুষটি। তাঁর কাছে গান শেখা শুরু করলেন শচীনকর্তা।

কৃষ্ণচন্দ্র দে

শচীনকর্তার প্রিয় নেশা তিনটে। গান, খেলা আর মাছধরা। প্রথম নেশার বন্দোবস্ত হল। মাছধরা এ শহরে সম্ভব নয়, সেটা যুক্তি দিয়ে মেনে নিলেন। বাকি রইল খেলা। ওয়াই এম সি এ-তে নাম লেখালেন। শুরু করলেন নিয়মিত টেনিস খেলা। ওখানে তখন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান খেলোয়াড়ের সংখ্যাই বেশি। তাঁরা 'গেঁয়ো ছেলে' হিসেবে শচীনকর্তাকে বেশ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই করতেন। জেদ চেপে গেল কর্তার। এর সমীচীন জবাব দিতেই হবে। প্রতিদিন ঠিক দুপুর দুটোয় এসে মাঠে খেলা শুরু করতেন। প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকতেন একজন নামী দক্ষিণ ভারতীয় খেলোয়াড়। তাঁর তালিমে বেশ দক্ষ হয়ে উঠছিলেন শচীনকর্তা। কিন্তু খেলা আর গান— দুইয়ের তালিম একসঙ্গে বেশিদিন চালানো গেল না। খেলতে গিয়ে প্রচন্ড ঘাম হচ্ছে। ঠান্ডা-গরমে গলা ভেঙে যাচ্ছে। এই গলায় গান হয় না। গুরু কৃষ্ণচন্দ্র বুঝতে পারলেন সমস্যাটা। বললেন, 'হয় গান, নয় টেনিস।' গুরুর আদেশ শিরোধার্য। খেলা ছাড়লেন শচীনকর্তা। সেইসঙ্গে ছাড়লেন পড়াশোনা।

শচীন 'কেষ্টবাবু'র ছাত্র হয়েছে জেনে অখুশি ছিলেন না নবদ্বীপচন্দ্র। পড়া ছেড়ে দেওয়ার কথা জানতে পেরে দুঃখ পেলেন। কলকাতায় এসে ছেলেকে আইন কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কে পড়বে আইন? মাস কয়েক খেয়ালখুশিমতো যাতায়াত করে আইন পড়াতেও ইস্তফা দিলেন শচীন। এবার চিন্তায় পড়লেন বাবা। কিন্তু তিনিও দমবার পাত্র নন। রাজ পরিবারের উত্তরাধিকারে তিনি যা সম্পত্তি পেয়েছেন, তাকে সামলে-সুমলে রাখার জন্যও ঠিকঠাক ট্রেনিং চাই। ছেলে তাহলে বিলেতে গিয়ে পড়াশোনা করে এটাই শিখে আসুক। এবার বাবার প্রস্তাব সরাসরি ফিরিয়ে দিলেন শচীন। স্পষ্ট জানালেন — বিলেতে তিনি যাবেন না এবং রাজপরিবারের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কোনও বাসনা তাঁর নেই। তিনি গান নিয়েই থাকতে চান।

আবদুল করিম খাঁ

১৯২৫ থেকে '৩০। গানের তালিমেই ডুবে রইলেন শচীনকর্তা। কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গুরু ছিলেন ওস্তাদ বাদল খাঁ। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে শচীন দেববর্মণ গেলেন বাদল খাঁ-র কাছে। ওস্তাদজীর বয়স তখন নব্বই। শুরু হল সংগীতের পাঠ। শাস্ত্রীয়সংগীতের ছাত্র যতই প্রতিভাবান হোক, নিবিড় চর্চার পাশাপাশি তাকে শুনতে হয় প্রাজ্ঞদের পরিবেশনা। বাদল খাঁ-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর কলকাতায় আয়োজিত প্রতিটি অভিজাত সংগীত আসরে উপস্থিত থাকতেন শচীনকর্তা। একটু একটু করে ভরে উঠতে লাগল তাঁর ভান্ডার। এরকম এক গানের আসরেই সংগীতবেত্তা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শচীনদেবের পরিচয়।

'ধূর্জটিদা ছিলেন আমার জীবনে সংগীতসাধনার

আশা ভোঁসলে

'কর্তা, তুমি চুপ কর তো। কিচ্ছু জানো না। এমন সাদা মানুষ!' তাঁর এই কথায় দাদা হো-হো করে হেসে উঠলেন। প্রাণ খোলা হাসি, একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো। আমি নির্বাক হয়ে শুধু দেখছিলাম। মীরাদি তাঁর ওপর রেগে গিয়েছিলেন।

আমি হেসে জিগ্যেস করলাম— কি হয়েছে দাদা?

'তোমার বউদিকেই জিগ্যেস কর না!'

আমি বউদির দিকে তাকাতেই তিনি বললেন— 'আরে, তোর দাদা এত আত্মভোলা লোক, একশো টাকার নোট দশ টাকা ভেবে দিয়ে দেয়। তুইই বল্, আমি যদি ওকে না সামলাই তবে কি হবে?'

সত্যি, দাদার মতো এমন সরল আত্মভোলা মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। তার এই স্বভাবের সঙ্গে চেহারার যে কি অদ্ভুত মিল ছিল! গায়ের রঙ ফর্সা। শরীর ঘিরে কেমন এক দ্যুতি। সব সময় সাদা ধুতি - পাঞ্জাবি পরতেন। যেন সৌম্যের প্রতীক।

মাঝে মাঝে ওঁকে রাগাবার জন্য দুষ্টুমি করতাম। একদিন বললাম, 'দাদা আপনার চেহারা, চুল, গায়ের রঙ একদম মঙ্গোলিয়ানদের মতো।' আমার কথা শুনে দাদা খুব জোরে হেসে উঠে বললেন, 'উঃ বড্ড বকবক করিস্! তুই একটুও চুপ করে থাকতে পারিস্ না? আমার কাছে যারা আসে, তারা কেউ ঠুংরি, কেউ বা গজল, তুই দেখছি একেবারে তারানা ......'

আমি মাঝে মাঝে বলতাম, 'দাদা এখনও আপনার গানে যৌবনের প্রাণস্পন্দন শোনা যায় কেন বলুন তো?' বলতেন, 'দেখ্ আশা, গানই আমার জীবন, আমার ধর্ম, আমার সব। একটা কথা সব সময় মনে রাখবি, যখনই গান গাইবি, তখনই গানের অর্থের সঙ্গে, তার চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলবি। যখন তুই ক্যাবারে গান গাইবি, নিজেকে হেলেন ভাববি।' কথাটা শুনেই আমি খিলখিল করে হেসে উঠতাম। উনি বলতেন, 'হাসিস না। দেখিস যতক্ষণ না তুই গানটাকে অন্তর দিয়ে অনুশীলন করবি, ততক্ষণ ভাল করে গাইতেই পারবি না।'

দাদাই আমাকে প্রথম গানের মধ্যে হাসতে শিখিয়েছিলেন। 'জানু জানু বি কাহে ছনকে হ্যায় তোরা কঙ্গনা'— এই গানটি আমি আর গীতা দত্ত গাইছিলাম। গানের একটা জায়গায় হাসির প্রয়োজন ছিল। তিনি দেখিয়ে দিলেন। আমি হাসলাম। কিন্তু দাদার পছন্দ হল না। বললেন, হাসার পর যদি তুমি নিঃশ্বাস নাও, তাহলে শুনতে খুব ভাল লাগবে। তাঁর কথামত করলাম। চমৎকার হল। আর সেই থেকেই গানের মধ্যে আমার হাসিটা খুব ফেমাস হয়ে গেল।

কিশোর কুমার

১৯৭৫-এ শচীনকর্তার প্রয়াণের পর বিনাকা গীতমালায় স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান হয়েছিল। কর্তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরা অনেকেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। একসময় পালা এল কিশোরকুমারের। সেদিন ঐ হিন্দি অনুষ্ঠানে কিশোরকুমার যা বলেছিলেন, তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়—

মুম্বাইতে এসেছিলাম অভিনয় করব, প্রযোজনা করব বলে। গান করার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। বুড়ো লোকটা আমার পিছু নিতেন। রাগ হত। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম।

একদিনের কথা। গাড়ি করে যাচ্ছি। ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি থেমেছে। হঠাৎ পাশ থেকে আওয়াজ শুনি 'আরে, কিশোইরা না!' দেখি ঐ বুড়োমানুষটা দরজা খুলে নেমে আমার গাড়িতে ঢুকে পড়লেন। ড্রাইভারকে বললেন, 'শহর ছাড়াইয়া গাড়ি লইয়া চল।'

গাড়ি চলতে চলতে একসময় সবুজ মাঠের ধারে পৌঁছয়। মানুষটা গাড়ি থেকে নেমে ক্ষেতের মধ্যে যান। হাঁটুর উপর ধুতি তুলে আল ধরে ধরে হাঁটতে থাকেন। গাইতে থাকেন একটার পর একটা গান। আমি কেমন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে যাই। দিকজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। কেবল মনে হতে লাগল, এই মানুটাকেই তো এতকাল খুঁজেছি। আজ থেকে ইনি যা বলবেন তার বাইরে কক্ষনো যাব না।'

এরপরই মনের মতো করে কিশোরকুমারকে গড়ে নিয়েছেন শচীনকর্তা।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মান্না দে-কে প্রবাসে পায়ের নীচে একটু মাটির সন্ধান করতে কী কষ্ট করতে হয়েছে, তা অকপটে আমায় বলেছেন। চোখের কোণে জলের রেখা এনে আমায় বলেছেন, জানেন 'তালাশ' ছবির 'তেরি নয়না তালাশ করকে....' এই গানটা তুলতে গেছি শচীনদার মিউজিক রুমে, পরিচালক এলেন গান শুনতে। শচীনদা আমায় বললেন, 'মানা, তুই গেয়ে শোনা।' পরিচালক বলে উঠলেন, 'মান্না দে গাইবেন নাকি? মুকেশ কী হল?' শচীনদা জবাব দিলেন, 'মুকেশ এ গান গাইতে পারবে না।' 'এমন গান কেন বাছলেন যা মুকেশ গাইতে পারবে না?' শচীনদা ওঁর নিজস্ব স্টাইলে হিন্দিতে উত্তর দিলেন, 'তালাশ' ছবি যদি এস ডি বর্মণ করে, তবে এই গানের সুরটাই থাকবে। আর গাইবে মানাই। তোমার অপছন্দ হলে তুমি অন্য মিউজিকডিরেক্টর নাও।

সবাই ওকে দাদা মানত। মুম্বই-তে হেমন্তদা যথারীতি হাসতে হাসতে বলতেন, 'যাচ্ছি শচীনদার গান শুনতে। কিন্তু কে গাইবে কেউ জানে না। মান্নাবাবু, তালাত, মুকেশ,

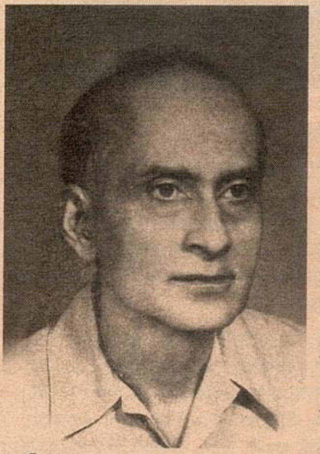

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উৎসাহদাতাদের অন্যতম।...... তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গান শুনেছেন। তবু জানি না কেন, আমার মত ক্ষুদ্র শিল্পীর গান শুনতে তিনি ভালবাসতেন।'

আজকের আকাশবাণী, সেদিনের Indian State Broadcasting Company থেকে গান পরিবেশনের জন্য ডাক পেলেন শচীনকর্তা। সে কী উত্তেজনা!

'আমার গান বেতারে প্রচারিত হবে সে কি কম কথা। প্রথম যেদিন গান করলাম, সেদিনের সে যে কী আনন্দ তা আজও ভুলিনি। শ্রী নৃপেন মজুমদার, শ্রী রাইচাঁদ বড়াল এঁরা সব তখন বেতার কোং-এর কর্তা। আমাকে পনেরো মিনিট গাইবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমার নিজের সুর সংযোজনায় দুখানা গান গাইলাম। পারিশ্রমিক পেলাম দশটাকা। আমার জীবনের প্রথম উপার্জন। লক্ষ টাকার থেকেও বেশি মনে হয়েছিল।'

গানের পরিমন্ডলে দিব্যি কাটছিল দিন। হঠাৎ ছন্দপতন। ১৯৩০-এ মারা গেলেন নবদ্বীপচন্দ্র। এই প্রথম শচীনদেব বুঝলেন ঠা ঠা রোদ্দুর আড়াল করে কত বড় একটা ছায়া ছিল! তাঁর স্বপ্নপূরণের যে দায় বাবা বহন করেছেন, অন্যেরা তা করবেন কেন?

ত্রিপুরা প্যালেসের খরচ প্রচুর। সেখানকার পাট উঠিয়ে একখানা ঘর ভাড়া নিলেন শচীনকর্তা। শুরু করলেন গান শেখানোর টিউশনি। রাজপরিবারের সম্মানহানির বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই তাঁর। প্রয়োজন নেই পারিবারিক অর্থ সাহায্যের। নিজের উপার্জন থেকেই কলকাতার খরচ বহন করতে লাগলেন।

এইসময়ই রঙ্গমঞ্চ থেকে ডাক এল। তখন গানই নাটকের প্রাণ! নীহারবালা অভিনীত 'সতীতীর্থ' এবং 'জননী'-তে সুরারোপ করলেন শচীনকর্তা। ভাল লাগল দর্শকদের। নাটকের সূত্রেই নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল ছবি বিশ্বাস এবং জহর গাঙ্গুলির সঙ্গে। জহর গাঙ্গুলির বাড়তি গুণ, তিনি ছিলেন শচীনকর্তার মতই খেলা পাগল। শচীনকর্তা ইস্টবেঙ্গল। জহর গাঙ্গুলি মোহনবাগান। খেলার কারণে দুই বন্ধুর ভাবও যত, ঝগড়াও তত।

১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর। হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস থেকে শচীনকর্তার প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হল। একপিঠে 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে'— গীতিকার হেমেন্দ্র কুমার রায়। অন্যপিঠে 'এ পথে আজ এসো প্রিয়'— গীতিকার শৈলেন রায়। দুটি গানেরই সুরকার শিল্পী স্বয়ং। লোকগান এবং রাগশ্রয়ী গান-দুই ধারার গানেই প্রশ্নাতীত দক্ষতার পরিচয় রাখলেন শচীনকর্তা। প্রকাশমাত্র হিট হল প্রথম রেকর্ড।

শচীনকর্তার রেকর্ডের গান প্রসঙ্গে তাঁর গাওয়া নজরুলগীতির কথা উল্লেখ করতেই হয়। জীবনের সৃষ্টিশীল সময় বেশ ক' বছর নজরুল কুমিল্লায় কাটিয়েছেন। পরিচয়ের সূত্রপাত সেখানে। শচীনদেব লিখছেন : আমি তাঁর স্নেহধন্য শিল্পী। তাঁর রচনা, গান, কবিতা, আবৃত্তি আমি বহু শুনেছি। তিনিও আমার গান ও সুর খুবই পছন্দ করতেন। .... তাঁর রচিত গান রেকর্ড করতে আমাকে আদেশও দিয়েছিলেন। আমার জন্যই বিশেষভাবে সেগুলি রচনা করেছিলেন তিনি। ..... অনেকেই আমার গাওয়া 'চোখ গেল, চোখ গেল কেন ডাকিস রে' গানটি শুনেছেন। এটি কাজীদার রচিত। প্রায় চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে লিখেছিলেন আমার জন্য, সুর দিয়ে। আমি কাজীদাকে বলেছিলাম—'ঝুমুরের ধরনে একটু 'টিকলিশ' সুরে গান দিন আমাকে'।.... কাজীদার সঙ্গলাভ আমার জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা।

শচীনকর্তার গাওয়া বাংলা রেকর্ডসংগীতের সংখ্যা ১৩১। এর মধ্যে ১২৭টি গেয়েছেন একক কণ্ঠে। ৪টি দ্বৈতকণ্ঠে, স্ত্রী মীরা দেববর্মণের সঙ্গে। অনেকেই গান লিখেছেন তাঁর জন্য। তবে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি লিখেছেন অজয় ভট্টাচার্য।

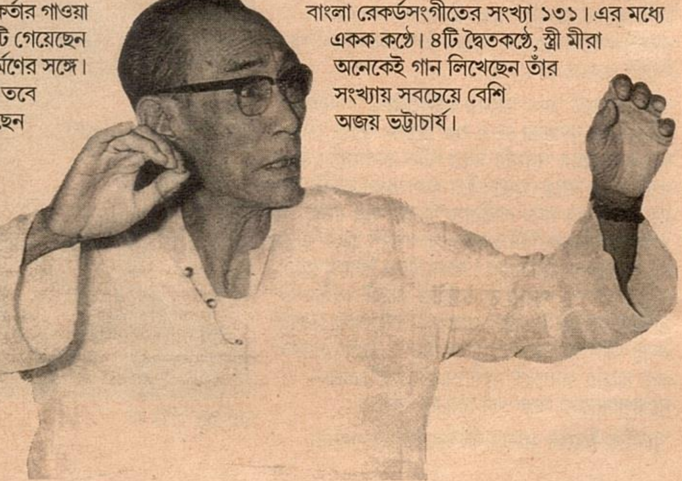

অজয় ভট্টাচার্য	— ৪১	জসীমুদ্দীন	— ২
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদাব	— ১৮	দুখাই খন্দকর	— ১
মীরা দেববর্মণ	— ১৬	কানাইলাল শীল	— ১
মোহিনী চৌধুরী	— ১২	কমল ঘোষ	— ১
রবি গুহ মজুমদার	- ১০	বিনয় মুখোপাধ্যায়	— ১
শৈলেন রায়	— ৭	প্রণব রায়	— ১
কাজী নজরুল	— ৪	রবীন মজুমদার	— ১
হেমেন্দ্র কুমার রায়	— ৩	শঙ্কর গুপ্ত	— ১
যতীন্দ্রমোহন বাগচী	— ২	শিশির সেন	— ১
প্রেমেন্দ্র মিত্র	— ২	অজ্ঞাত	— ৬

তথ্যসূত্র ঃ 'শচীনকণ্ঠ' / কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য। দেশ, বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৫

যেসব গানের কথায় নিজে সুর দেননি শচীনকর্তা, শুধু গেয়েছেন, তার সংখ্যা —

সুরসাগর হিমাংশু দত্ত	— ৮	সুবল দাশগুপ্ত	— ১
কাজী নজরুল ইসলাম	— ৪	রাইচাঁদ বড়াল	— ১
শৈলেশ দত্তগুপ্ত	— ২	মুকুন্দলাল দে	— ১

১৯৩৪। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স হবে। শচীনকর্তা আমন্ত্রিত হলেন। গাইলেন ঠুমরি এবং বাংলা গান। শ্রোতারা অভিভূত। একেবারে নতুন আস্বাদ! এখানেই আবদুল করিম খাঁ-র সঙ্গে প্রথম দেখা হয় তাঁর। ওস্তাদজী মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। এরপর আরও তিনবার এলাহাবাদের কনফারেন্সে আমন্ত্রণ পেয়েছেন শচীনকর্তা। ইতিমধ্যে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কেও সংগীতগুরু হিসেবে পেয়েছেন তিনি। নিয়ত অনুশীলনে নিজেকে ক্রমশ পরিণত করে তুলেছেন।

জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বাড়ছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও। একটা ছোট্ট ঘরে আর কুলোয় না। এবার দু'ঘরের বাড়ি ভাড়া নিলেন শচীনকর্তা। শুরু করলেন গান শেখাবার স্কুল 'সুরমন্দির'। গান নিয়ে আছেন, এদিকে বিয়ের বয়স যে পেরিয়ে যায়!

১৯৩৮-এর ১০ ফেব্রুয়ারি। ঘর বাঁধলেন ছাত্রী মীরার সঙ্গে। মীরা দেবীর মা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। দাদামশাই হাইকোর্টের খ্যাতনামা জজ। মীরা দেবী সম্পর্কে শচীনদেব লিখছেন—

'মীরা ১৯৩৭ সাল থেকে আমার কাছে গান শিখত। আমার ট্রেনিং-এ কয়েকটি গান রেকর্ডও করেছিল। ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ সঙ্গীত সম্মেলনে মীরাও গান করার সুযোগ পেয়েছিল, আমারই মত। সে সময় মীরা ভীষ্মদেবের কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ও শান্তিনিকেতনের শ্রীমতী অমিতা সেনের (পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা) কাছে নাচ শিখত। পরে মীরা শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের কাছে ঠুমরী ও কীর্তন এবং শ্রী অনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতও শিখছিল। আমার সঙ্গে ১৯৪৪ সালে বম্বে আসার পর, মীরা বম্বেতে কিরাণা ঘরাণার ওস্তাদ ফৈয়াজ মহম্মদ খানের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখে। মীরা রেডিওতে গান গাওয়া ছাড়াও আমার তত্ত্বাবধানে এইচ এম ভি-তে কয়েকটি হিন্দী গানও রেকর্ড করেছে।'

১৯৩৯-এ স্বরলিপিসহ শচীনকর্তার পঁচিশটি গান প্রকাশ করল ডি এম লাইব্রেরি। বইয়ের নাম 'সুরের লিখন।' বাবাকে এই বই উৎসর্গ করেছিলেন শচীনকর্তা। এই বছরই ২৭ জুন শচীন মীরার একমাত্র সন্তান রাহুলের জন্ম হল।

গানের আরও বৃহত্তর পরিধিতে পৌঁছতে চান শচীনকর্তা। চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনার কাজ করলেন কয়েকটি। কিন্তু তেমনভাবে সাফল্যের মুখ দেখলেন না।

স্ত্রীর সঙ্গে শচীনদেব

রফি সবাই গান তুলবেন। যাঁর কণ্ঠে এই বিশেষ গানটি ওর পছন্দ হবে তিনিই শেষ পর্যন্ত রেকর্ড করবেন।' এহেন এস ডি বর্মণকে দিয়ে আমার লেখা গান গাওয়ানোর জন্য ধরলাম সহৃদয় সুশীলদাকে। 'মেলডি'-র দুলাল চক্রবর্তীর পিতা সুশীল চক্রবর্তী ছিলেন শচীনদার খুবই কাছের মানুষ। শচীনদা মুম্বই থেকে যখন মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, তখন ঘড়ি-ধরা সময়ে ওই 'মেলডি'র পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন।

একদিন সুশীলদা বললেন, ওমুক তারিখে সকালে ঠিক ওমুক সময়ে তুমি এসো। কর্তা কিন্তু খুব টাইমের মানুষ। দেরি করো না। গেলাম। সুশীলদা আলাপ করালেন। প্রণাম করলাম। বললেন, 'ওহে তুমি পুলক। মানা আমার কাছে তোমার খুবই সুনাম করে।' এইটুকু বলেই চুপ করে গেলেন। সুশীলদা ধরিয়ে দিলেন, 'পুলক গান নিয়ে কলকাতার বাড়িতে কবে যাবে?'

নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে পকেটে গান নিয়ে গেলাম শচীনদার কলকাতার বাড়ি সাউথএন্ড পার্কে। আমাকে হারমোনিয়ামটা দেখিয়ে বললেন, 'শোনাও'। আমতা আমতা করে আমি বললাম, 'আপনি ভুল করছেন। আমি গান গাই না, গান লিখি।' শচীনদা বললেন, 'হ হ শুনাও।' আবার আঙুল দিয়ে দেখালেন হারমোনিয়ামটা। ছোটবেলায় বাবার কাছে অরগান শেখা আমি মরিয়া হয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কী একটা গান গেয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিলেন উনি। বললেন, 'ব্যস্ ব্যস্ আর নয়। তোমার হবে রে ভাই হবে। ভাল গান লিখতে হলে তোমাকে গান জানতেই হবে। বম্বের সব রাইটাররাই রীতিমতো গাইতে জানেন। ওঁরা যখন ওঁদের লেখা গান মিউজিক ডিরেক্টরকে দেন, সে গানটা নিজের সুরে গেয়ে শুনিয়ে তবে দেন। তুমিও যদি সেটা করতে পার, কেউ তোমাকে রুখতে পারবে না ভাই।'

শচীনদার কাছ থেকে আমি কথা আদায় করে নিলাম, উনি আমার গান গাইবেন। বললেন, গানের জন্য ঠিক ওমুক মাসে ওমুক তারিখে আমাকে মুম্বইতে যেতে।

নির্দিষ্ট তারিখে লিংকন রোডে শচীনদার জেট বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। শচীনদা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি বিনীতভাবে বললাম, 'আপনি তো এই সময়েই এখানে আসতে বলেছিলেন।' বললেন, 'হ হ, তুমি বসো।'

ঘরে আরও লোকজন ছিলেন। এক ভদ্রলোক আমার সামনেই তাঁর হাতের ছোট টিনের সুটকেশ খুলে ওঁকে দেখালেন নোটের গোছা। শচীনদা বললেন, 'তুম জিতনা রূপাইয়া দেখাও হাম তুমারা পিকচার নেহি করেঙ্গা।' ভদ্রলোকের অনেক কাকুতি মিনতি উপেক্ষা করে শচীনদা তাকে বিদায় দিলেন। ঘরে বসা অন্য এক ভদ্রলোক বললেন, দাদা, 'সাত সকালে এতগুলো টাকা ছেড়ে দিলেন?' উনি বললেন, 'কুয়া জান? পাতকুয়া? পাতকুয়া থেকে একসঙ্গে সব জল তুলে নিলে কুয়া শুকিয়ে যায়। কুয়াতে জল জমবার সময় দিতে হয়। মিউজিক ডিরেকশনও তাই। টাকার লোভে একগাদা ছবিতে কাজ করলে আমি ফুরিয়ে যাব। আমার ইয়ারলি কোটা আছে। তার বেশি

আমি কাজ করি না। আমার এ বছরের কোটা কমপ্লিট। যে যত টাকাই দিক এ বছরে আর আমি ছবি করব না।

মান্না দে

তাঁর কাছেই শিখেছি একটা গান বার বার গেয়ে কিভাবে পূর্ণতায় পৌঁছতে হয়। নিজেও সুর তৈরি করে সকাল দুপুর সন্ধে গাইতেন। লোক বেছে বেছে শোনাতেন। গান তোলানোর সময় যা দরকার, শিল্পীদের থেকে টেনে বের করে নিতেন। লতা, আশা, গীতা, রফি কেউই রেহাই পেত না। মনটা জওয়ান ছিল। খুব হিউমার করতেন। আমার সঙ্গে তো অনেক আগে থেকেই পরিচয়— ৯, মদন ঘোষ লেনে যখন কাকার (কৃষ্ণচন্দ্র দে) কাছে আসতেন। খেলার পাগলামি ছিল শেষ পর্যন্ত। খেলা থাকলে ফাইনাল রেকর্ডিংও বন্ধ করে দিতেন। স্টুডিও থেকে ট্রেনে চেপে চার্চ গেট-এ এসে, খেলা দেখে বাড়ি ফিরতেন।

ব্রজেন বিশ্বাস

কর্তার কথা কী বলব! সারাজীবন সঙ্গ পেয়েছি। গান তৈরির সময় থেকেছি। এত কথা, এত স্মৃতি — কোনটা রেখে কোনটা বলি! তবে একটা কথা বলতে পারি— আমাদের দেশজ গান, মাটির গান, লোকগানের মধ্যে ছন্দের সে কী সম্পদ আছে, সেটা কর্তার আগে কেউ বোধহয় এমন করে বোঝেনি বা বুঝলেও আধুনিক গানে তাকে সেইভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। একটা কথাকে নানা ছন্দে বলার মজাটা তিনি যেভাবে আধুনিক গানে ব্যবহার করেছেন, সেটা তাঁর আগে আর কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই। কর্তার গান তৈরির মূল ভরটাই ছিল আমাদের দেশ গাঁয়ে শোনা গানগুলির উপর। একটা ঘটনার কথা বলি।

বোম্বে থেকে কলকাতায় এসেছেন কর্তা। আড্ডা জমেছে সাউথ এন্ড পার্কের বাড়িতে। গান বাজনার জগতের অনেক লোক এসেছেন। কথা বলতে বলতে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন কর্তা। হঠাৎ থামিয়ে বললেন, 'আরে জাননি, শক্তি একটা ছবি করতাসে। আমারে কইল সুর দিতে। আরও কইল একটা সেক্সের গান করতে হইব। কি হইল জানস, বহুকাল আগের একটা কথা মনে পইড়্যা গেল। এক ব্যাটার বাড়িতে গেছিলাম। তারে ডাকতাছি। কিছুতেই আর বাইর হয় না। অনেক পরে ঘরের থেইক্যা বাইরে আইল। দিলাম ব্যাটারে বকা। কয় কি, 'কর্তা মাফ করেন। পোলাডারে বিয়া দিমু আইজকা, তাই কাপড় পরাইতাছিলাম।' যখন আমাগো কথা হইতাসে, তখন

১৯৪২। মুম্বাইয়ের রঞ্জিত স্টুডিওর কর্ণধার চন্ডুলাল শা-র কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল সংগীত পরিচালনার জন্য। ফিরিয়ে দিলেন। না, বাংলা মায়ের কোল ছেড়ে যেতে মন চায় না।

১৯৪৪-এ আবার আহ্বান। আমন্ত্রণ জানালেন চন্ডু শা আর শশধর মুখার্জি। এবার আর ফেরালেন না শচীনকর্তা। এক বুক অভিমান নিয়ে মাটি ছাড়লেন। কে না চেনেন তাঁকে? নীতিন বসু, দেবকী বসু। প্রমথেশ বড়ুয়া আর তিনি তো একসঙ্গে টেনিস খেলেন। সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল, নিউ থিয়েটার্স -এর বি এন সরকার সবাই তাঁর গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেউ কি একবার একটা সুযোগ দিতে পারেন না! — কলকাতা ছাড়লেন এক বুক জেদ নিয়ে। চলচ্চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠা তাঁকে পেতেই হবে।

সব ভুলে যাই তাও ভুলিনা বাংলা মায়ের কোল

১৯৪৪ — ১৯৭৫

ফিল্মিস্তানে এসে প্রথম সংগীত পরিচালনা 'শিকারী' ছবিতে। নায়ক অশোককুমার। গীতিকার প্রদীপ। প্রথম কাজ নিয়ে বেশ ভাল লেখালিখি হল কাগজপত্রে। সাহস পেলেন শচীনকর্তা। পর পর আরও পাঁচটি ছবির কাজে চুক্তিবদ্ধ হলেন — 'এইট ডেজ', 'দো ভাই', 'শবনব', 'পেয়িংগেস্ট' আর 'মুনীমজী'। 'শবনম'—এর সব কটি গান হিট হল। গানের সমঝদাররা বাহবা দিতে লাগলেন। কিন্তু কর্তার মন ভরছে না। সাধারণ মানুষ গুনগুন করে না গাইলে, বুঝতে হবে সে গান তারা নেয়নি। কলকাতার রাসবিহারী মোড়ের বিখ্যাত দোকান 'মেলডি' -তে বসে এ প্রসঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে একবার নৌকোয় চলেছেন। উদ্দেশ্য, মাঝিদের গান শুনে গান সংগ্রহ করা। কথায় কথায় এক মাঝি বলল, 'একজন রাজার পোলা খুব ভাল গাইতাসে। গলাডা এমুন মিষ্টি, য্যান হালায় কোকিল বাইট্যা খাইসে।' শচীনকর্তা বললেন, 'তুমি দেখস তারে?'

'না কত্তা, দেহি নাই। দ্যাখলে পায়ের ধুলা মাথায় নিতাম।' এ-ই হল মানুষের কাছে পৌছনো। মুম্বাইয়ে চায়ের দোকানের ছেলে, রিক্সাওয়ালা, গাড়ির ড্রাইভার ক্লিনার এরা যদি সিনেমার গান গুনগুন না করে তবে সুর দেওয়ার মানে?

যামিনী দেওয়ানের 'রতন' রিলিজ করল। বেরোতেই হই চই। সব ক'টা গান লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

একদিন শচীনকর্তা ঘরে বসে হারমোনিয়ামে একটা গানের সুর করছেন, হঠাৎ কানে এল... 'যব তুমহি চলে পরদেশ, লাগাকর ঠেস ও পীতম পেয়ার'.... চা করতে করতে তাঁর বেয়ারা গানটি গাইছে। মনটা আনন্দে ভরে গেল। এটাই তো চাইছিলেন।

দিন কয়েক পরের কথা। 'দো ভাই' ছবির গানের সুর করছেন ঘরে বসে। একটা গান তৈরি হয়ে গেছে— মেরা সুন্দর সপনা বীত গয়া। আরেকটা গানের প্রস্তুতি চলেছে। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে সুর ভেসে এল। কী আশ্চর্য! সেই রুম বয় ছেলেটি মশগুল হয়ে গাইছে.... মেরা সুন্দর সপনা বীত গয়া'। শচীনদেবের নিজের কথায়, 'তখনই বুঝতে পারলাম, ফিল্মের হিট গান মানে হল অতি সোজা সুর, যত কম অলঙ্কার থাকে ততই ভাল। সাধারণ লোক গলায় তুলতে পারে সহজে।'

একের পর এক ছবিতে সুর দিতে লাগলেন কর্তা। হিটও হতে লাগলো। নিজে কিন্তু খুব বেশি গাইছেন না। নিজের জীবনে সুরসৃষ্টির বেলায় তাঁর কতগুলো দাপট ছিল। এটা হয়তো তাঁকেই

ছবিঃ গৌরি সেন

মানায়। অন্যের সুরে কদাচিৎ গাইতেন এবং হিন্দি ছবিতে যে ক'টি গান গেয়েছেন, শর্ত ছিল, সেই গানে কোনও অভিনেতার লিপ দেওয়া চলবে না। গানগুলি নেপথ্যসংগীত হিসাবে ছবিতে থাকবে।

সাফল্যের মন্ত্র পেয়ে গেলেন। এবার তিনি জয়রথের রথী। শুধুই এগিয়ে চলা। অসংখ্য ছবির অজস্র হিট গান তৈরি করে বাংলার শচীনকর্তা হয়ে উঠলেন ফিল্মিস্তানের কিংবদন্তী এস. ডি. এই অধ্যায় সবারই জানা।

শৈশব কৈশোরে কুমিল্লা, যৌবনে কলকাতা আর পরিণত বয়সে কর্মক্ষেত্র মুম্বাই — শচীনকর্তা নিজেই তাঁর জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন 'সরগমের নিখাদ'-এ। মুম্বাই তাঁকে যশ, অর্থ, খ্যাতি, মান, প্রতিষ্ঠা সব দিয়েছে। এক বুক অভিমান নিয়ে বাংলা ছেড়েছেন। তবু তাঁর প্রান্তবেলার উপলব্ধি, 'নিজের শুধু এই পরিচয় যে আমি বাংলা মায়ের সন্তান এবং আমার সুরসৃষ্টি সমগ্র ভারতবাসীর সম্পদ — আমার সুর ভারতবর্ষের প্রতীক।'■

উত্তরকালের চোখে

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

গায়ক এবং সুরকার--দুই ভূমিকাতেই শচীন দেববর্মণ সমান সফল বলে আমি মনে করি। দুটি ক্ষেত্রেই তাঁকে খুব উঁচুতে স্থান দিই। গানের ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর একটা বড় কথা। কণ্ঠস্বরের মৌলিকতা না থাকলে একজন গায়ক বা গায়িকার বেশিদূর পৌছনো সম্ভব নয়। কারণ মানুষ সাধারণত তাঁকেই গ্রহণ করে, যাঁর গানের মধ্যে কোনও স্বাতন্ত্র্য বা একেবারে নিজস্বতা আছে। শচীনদেবের কণ্ঠস্বরে এটা ছিল। তা দিয়ে তিনি মানুষের মনের এমন একটা সংবেদনশীল জায়গা ছুঁয়ে যেতে পেরেছেন, যেটা তার আগেই অধরাই ছিল। আর নিজে সুরকার ছিলেন বলেই খুব ভাল বুঝতে পারতেন, তাঁর কণ্ঠে কোন গান কিভাবে খেলবে। এটাই শচীন দেববর্মণের সফলতা বা সার্থকতার চাবিকাঠি বলে মনে করি। সুরকার শচীনদেব সম্পর্কে একটা কথা বলি-'জ্বলতে হ্যায় যিসকে লিয়ে' এই গানের অন্তরার সুরটা আজও আমি যতবার শুনি, মনে হয়, এই একটি গানে কোনও প্রেমিক তার প্রেমিকাকে হৃদয়ের সব আর্তি উজাড় করে দিতে পারে। আর কিছু র প্রয়োজন নেই।

অনল চট্টোপাধ্যায়

লোকসংগীতের সঙ্গে শাস্ত্রীয়সংগীতের কোনও যে বিরোধ নেই, নান্দনিক বোধ নিয়ে মেশাতে পারলে দুই ধারার সমন্বয়ে সে যে কী অসাধারণ সব সৃষ্টি করা যায়, তা আমাদের দেখিয়েছেন শচীন দেববর্মণ। সব কিছু আহরণ করব, কিন্তু দেবার সময় সেটা আমার নিজের হয়ে উঠবে, একেবারে স্বতন্ত্র, অসংখ্যের ভিড়ে সে হারিয়ে যাবে না--এটা কিভাবে সম্ভব করতে হয়, সেই দৃষ্টান্ত শচীনদেব রেখে গেছেন আমাদের সামনে। একটা ঘটনার কথা বলি, হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শচীনকর্তা যখন কলকাতায় আসতেন, তখন 'মেলডি'-তে বসে নতুন কী গান বেরোল, কে কেমন কাজ করেছে খোঁজ খবর নিতেন। গান শুনতেন। সেইসময় একদিন আমি 'মেলডি'-র সামনে দিয়ে যাচ্ছি। তখন 'মধুমতী যায় বয়ে যায়' গানটা বেরিয়েছে। দোকানের সামনে দিয়ে আমাকে যেতে দেখে দুলালদা এগিয়ে এসে ডাকলেন- 'দ্যাখ কে তোর গান শুনছে'। ঢুকে দেখি শচীন দেববর্মণ একবার শোনা শেষ করে আবার গানটা শুনতে চাইছেন। আমি কাছে যেতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'এই তো গান, আসল বাংলার গান। এই গান বাঙালি শুনতে বাধ্য'।

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

শচীন দেববর্মণ-আদ্যন্ত বাঙালি। মনে প্রাণে, চলনে বলনে, পোশাকে-আসাকে। কিন্তু 'গান' এই শিল্প মাধ্যমটিকে কিভাবে 'গ্লোবাল' করে তোলা যায়, আমাদের শিখিয়ে গেছেন। ভরাট মিষ্টি কণ্ঠস্বর না হলে গায়ক হওয়া যায় না-- এই ধ্যানধারণাকে তছনছ করে বাংলা গানের জগতে দাপিয়ে রাজত্ব করে গেছেন। চলে যাওয়ার পর তাঁর আসনটি কিন্তু আজ অবধি শূন্যই রয়ে গেল। পুরনো গানের এত তো রিমেক হচ্ছে। শচীন দেববর্মণের গান হচ্ছে না কেন? আসলে, কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের অনুসরণ করা যায়, অনুকরণ নয়। শচীন দেববর্মণ তেমনই এক শিল্পী। আ কমপ্লিট মিউজিক্যাল পার্সোন্যালিটি।

একটা ছোট্ট মাইয়া দেখি ঝিক লইয়া খেলতাছিল। পোলাডারে দেইখ্যা মাইয়াডা হাইস্যা উঠল। আমি কইলাম, 'এইটুক পোলারে বিয়া দিবি কি?' ব্যাটায় কয়, 'অহন দেওনই ভাল। নাইলে বিগড়াইয়া যাইতে পারে।' শুইন্যা ওই এক ফোঁটা মাইয়ার কী হাসি! আর হাসতে হাসতে গাইয়া উঠল — 'কালকে যাব শ্বশুরবাড়ি/ আহ্লাদে খাই গড়াগড়ি/ দেখব তোরে প্রাণভরে সুন্দরী।'

শক্তির কথা শুননের পর এই গানডার কথা আমার হঠাৎ মনে পড়ল। ঠিক কইর‍্যা ফালাইলাম, গানডার লয়ডারে কমাইয়া কিশোইরারে গাইতে কমু। আর কমু জোরে জোরে এট্টু নিঃশ্বাস ফালাইতে। তাইলেই তো সেক্সের গান হইয়া যাইব।'

এই গানটা হল বিখ্যাত সেই 'রূপ তেরা মস্তানা'। এইভাবেই কত গানের সৃষ্টি!

ব্রজেন বিশ্বাসের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে, তখন পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী, গীতা বিশ্বাস। লাজুক হেসে প্রশ্ন করলেন, 'শুধু কি কর্তার গানের কথাই জানতে চান? আর কিছু না? আমার হাতের রান্না খেতে খুউব ভালবাসতেন। ডাকতেন 'বড় বউমা' বলে। যখনই কলকাতায় আসতেন, রান্না করে খাওয়াতাম। খুউব প্রিয় ছিল লাউচিংড়ি, চিংড়িমাছের মালাইকারি আর মুড়িঘন্ট। ঘটিরা যেরকম ডালে মাছের মাথা দিয়ে করে, সেটা না। বলতেন, 'আমাগো দ্যাশের মুড়িঘন্ট খামু।' বড় রুই মাছের মাথা আর চাল দিয়ে যেটা রান্না হয়। খাইয়ে খুব তৃপ্তি পেতাম।'

দেবাশিস বসু

শচীনকর্তা স্মরণে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান। প্রাইভেট চ্যানেল। নামী দামী শিল্পীরা ওর সুরে মুখে মুখে সেরা গান শোনাচ্ছেন। যন্ত্রশিল্পীদের সামনে নোটেশন। শুধু মনোহারী সিংয়ের সঙ্গে ইংলিশ ফ্লুট, স্যাক্সোফোন। স্বরলিপি নেই, বাই হার্ট বাজাচ্ছেন। একসময় মঞ্চে এলেন গীতিকার মজরুহ সুলতানপুরী। স্মৃতিতে ডুব দিলেন। কর্তা ওঁকে মুজরু বলে ডাকতেন। দুটো ঘটনার কথা বললেন। 'মনোহারী, তোমার মনে পড়ে উনি একবার একটি গানের প্রিলিউড পঞ্চম (রাহুলদেববর্মণ) আর তোমাকে করতে দিয়েছিলেন?' মনোহারী সিং মাথা ঝুঁকিয়ে হাসলেন।

এসডি'র কম্পোজিশন। রাত জেগে মনোহারী সিং আর আর. ডি. দুর্দান্ত একটা প্রিলিউড করলেন। পরের দিন সকালে কর্তা গালে হাত দিয়ে চোখ বুজে শুনতে বসলেন। একটু পরেই 'ধ্যাৎ'। স্বভাবতই ওঁরা দুজন হতাশ, অবাক, বিভ্রান্ত। বাতিল করার কারণটিও বললেন কর্তা। 'দেখ বাবা, কোন নারী যদি খুব সুশ্রী, সুন্দরী হয় তাকে বেশি অলংকারে সাজাতে নেই। গানের বেলাতেও তাই।' ■

কল্যাণ সেন বরাট

শচীন দেববর্মণকে আমি বলি ছন্দের রাজা। গানের যে-স্ক্যানিং তিনি করেছেন, সেটা ভাবা যায় না! লোকসংগীত এবং শাস্ত্রীয়সংগীতের ব্লেন্ডিং-এর ক্ষেত্রেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এত মিষ্টি সুর যেন বাংলার প্রাণটা ধরে রেখেছেন। বেসিক সঙ এবং ফিল্ম সঙ দুটো ক্ষেত্রেই শচীনদেব সফল স্রষ্টা। উনি একটা কথা বলতেন, সিনেমায় লোকে গান দেখে, শুধু শোনে না। তাই তাঁর তৈরি সিনেমার গানে আমরা অসম্ভব সুন্দর সব চিত্রকল্প পাই। গানটা শুনতে শুনতে মনে হয় যেন চোখের সামনে ছবি ফুটে উঠছে। তাঁর গায়কির ক্ষেত্রেও বলব, সুরের যাদুর সঙ্গে ছন্দের খেলা মিশেছে বলেই সে গান আজও অনন্য হয়ে আছে। আর এক্সপ্রেশন! বলতে হয়, তোমার তুলনা তুমি প্রান!

শুভ দাশগুপ্ত

খুব ছোটবেলায় শচীনবর্মণের গান যখন শুনি, তখনই একধরনের ভালোলাগা তৈরি হয়েছিল। সেই সময় পুরনো দিনের গায়ক গায়িকাদের গান যে খুব ভালো লাগত, এমন নয়। তার মধ্যেই ব্যতিক্রম শচীনদেব। শচীনদেবের গানের ছন্দ আমাকে মুগ্ধ করত। গায়ক শচীনদেবকে পেরিয়ে সুরকার শচীনদেবকে দেখতে বা বুঝতে পারলাম আরও খানিকটা বড় হয়ে, যখন হিন্দি ছবি দেখতে শুরু করেছি। এত সহজ, এত অনায়াসে বুকের মধ্যে গানগুলি চলে আসত আর কিভাবে ভালোলাগায় মাখামাখি হয়ে যেত, যেন বুঝে উঠতে পারতাম না। দেবানন্দের ছবি, গুরু দত্তের কয়েকটা ছবির বড় আকর্ষণ ছিল শচীন দেববর্মণের সুরারোপিত গান। বয়স যখন আরও একটু বাড়ল, নিজে গান বাজনার জগতে এলাম, তখন একটু একটু করে আরেকটা বিস্ময়ের জগৎ খুলে গেল। শচীন দেবের গানের আরেকটা দিক নতুন করে উপলব্ধি করতে পারলাম। সেটা হল তাঁর গান গাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং প্রত্যেক শিল্পীর গায়কি মনে রেখে বিশেষভাবে তাঁর জন্য গানের সৃজন। লতা, আশা, কিশোর, রফি, মান্না দে— কে নয়? দিকপাল সব শিল্পীরাই তাঁর সুরারোপিত গান গেয়েছেন। মান্না দে একবার বলেছিলেন, 'শিল্পীদের গান তোলানোর সময় ছোটখাটো সমস্ত নির্দেশ শচীনদেব দিয়ে দিতেন। নিজে ইমপ্রোভাইজ করে কিছু করব, এমন সাহস বা সুযোগই থাকত না। এ কথা সব শিল্পীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। মনে পড়ছে 'গাইড' ছবির কথা। সাতটা গান মহম্মদ রফির গাওয়া। একটি কিশোরের কণ্ঠে। অথচ গোটা ছবিতে কী অমোঘ হয়ে উঠেছে ঐ গান। এখানেই বোঝা যায়, শচীনদেব শুধু সার্থক স্রষ্টা নন, সফল রূপকার।

আর এক্সপেরিমেন্ট? সেই সময় দাঁড়িয়ে সুর ছন্দের মিলমিশে নতুন নতুন ভাঙাগড়ায় এমন কালজয়ী গান ক'জন সৃষ্টি করেছেন? একটা গান 'তালাশ' ছবির 'পলকোঁ কী আঁখোসে'। মহম্মদ রফি, লতা মঙ্গেশকরের ডুয়েট। গানটার প্রত্যেকটা অন্তরা কাহারবায়। অথচ মুখড়াতে কিছুতেই বোঝার উপায় নেই, এটা কাহারবা। অদ্ভুত লুকোচুরির মজা।

আর এই যে গানের অ্যারেঞ্জমেন্ট, যা নিয়ে এখন এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সেখানেও কম ইনোভেশন ছিল? প্রিলিউড ইন্টারলিউডের কথা বাদ দিয়ে একটা গানের কোডা-র কথা বলি। 'জুয়েল থীফ'- এর 'হোঁঠো পে অ্যায়সী বাত' গানটার কথা মনে করুন। গান শেষ হয়ে যাবার পর সাত মিনিটের মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট। তাতে যত রকম তালবাদ্য আছে, সব বেজেছে। অনন্যপূর্ব ভাবনা! অসাধারণ প্রয়োগ!

বিভিন্ন স্বাদের গান রচনাতেও তিনি আনপ্যারালাল। দুঃখের গান, প্রেমের গান, প্রকৃতির গান এসব তো আছেই। কিন্তু 'চলতি কা নাম গাড়ী' ছবির গান? মজার গান, হাসির গানেও দুর্দান্ত সফল।

আরেকটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না, আপাতদৃষ্টিতে শচীনদেবের মধ্যে রাবীন্দ্রিক ঘরানার লেশমাত্র নেই। কিন্তু তাঁর বহু সফল গানের পরতে পরতে রয়ে গেছে, রবীন্দ্রসংগীত। এ যেন এক নীরব ভালোলাগার প্রকাশ। সকলেই বলেন তাঁর ব্লেন্ডিং এর কথা। লোকসংগীত, শাস্ত্রীয়সংগীত, পাশ্চাত্যসংগীত সব কিছুকে মিলিয়েছেন অদ্ভুত দক্ষতায়, নজিরবিহীন নান্দনিকতায়। আসলে, মনে হয়, যেখান থেকে যা-ই আহরণ করুন, শচীনদেব এবং রাহুলদেবের বুক জুড়ে ছিল একটা সবুজ বাংলা। সেই মাটিতে জারিত হয়েছে সব কিছু। তার প্রাণরস নিংড়ে উঠে এসেছে যে-গান সেই গান প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবহমান থাকবে। পুনা যদি কোনওদিন ফিল্ম ইনস্টিটিউটের মত কোনও মিউজিক ইনস্টিটিউট যদি গড়ে তোলা হয়, সেখানে একটা আলাদা অধ্যায় পড়ানো হবে— বিষয় শচীন দেববর্মণ।

সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায় (ভূমি)

বেঁচে থাকলে এখনও সমান জনপ্রিয় হতেন শচীন দেববর্মণ। ওঁর চিন্তাভাবনায় ছিল আধুনিকতার ছাপ। তাই আজকের দিনে ঠিক কী ধরনের গান শ্রোতা পছন্দ করবেন সেটা বুঝতে ওঁর কোনও অসুবিধেই হত না। এমনকি নতুন প্রজন্মের কাছেও ওঁর সংগীত সমানভাবেই সমাদৃত হত। এটা মনে রাখতে হবে যে শচীন দেববর্মণই প্রথম মানুষ যিনি বাংলা লোকসংগীতকে জাতীয় স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বাংলার নিজস্ব সুর ও ছন্দের চমৎকার মিশেল ঘটিয়েছিলেন বহু জনপ্রিয় হিন্দি গানেও। এমনই একটি বহুশ্রুত উদ্দীপক গান 'রূপ তেরা মস্তানা' যে আদতে একটি আঞ্চলিক সুরের কাঠামোতে ঢালা সেটা জানা না থাকলে কারও কি বিশ্বাস হবে? তবে, অনেকেই আছেন যাঁরা শচীনদেবের হিন্দি গানগুলোই বেশি শুনেছেন। জানেনই না যে এগুলোর অরিজিনালটা বাংলা। আর সব শেষে বলি, আজকে শচীনদেব বেঁচে থাকলে মোটেও বাংলা ফোক ব্যান্ড 'ভূমি'র কম্পিটিটর হতেন না। অথবা এভাবে বলা ভাল যে কোনদিন ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার যোগ্যতাই হবে না আমাদের। উনি আমাদের থেকে হাজার হাজার গুণ বেশি শিক্ষিত মানুষ। ওঁর গান, ওঁর সংগীত থেকে প্রতিনিয়ত শিখছি আমরা। কত কিছু যে জানছি! 'ভূমি' ওঁর কাছে শিক্ষার্থী মাত্র। উনি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে যাবেন কেন?

একটি উজ্জ্বল উদ্ধার

একটি চিঠি। অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেনের লেখা, তাঁর ছাত্রী, স্বামী সন্তানহারা একাকিনী মীরাকে। 'আলোবাতাস' পত্রিকার পৌষ ১৪০৭ (ডিসেম্বর, ২০০০) সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই চিঠির নির্বাচিত অংশ।

স্নেহের মীরা,

আমার কাছে তুই আজও সেই রকমই ছোট্ট মীরা। তোর সেই সুন্দর উজ্জ্বল চেহারাটিই আমার মনে গেঁথে আছে। ... তোরা থাকতিস ঢাকায় উয়ারির র‍্যাংকিং স্ট্রীটে, আমরা থাকতাম লারমিনি স্ট্রীটে। সকাল সন্ধ্যা তুই দৌড়ে দৌড়ে আসতিস আমার কাছে, নাচ শিখতে। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল তোর নাচের প্রশংসা, কতো প্রতিষ্ঠান থেকে তোর ডাক আসত। ... এর মধ্যে স্বামীর সঙ্গে আমি চলে গেলাম বিদেশে। মনে পড়ে, যেদিন ফিরে এলাম, সেদিনই তুই দৌড়ে এলি আমার কাছে। উত্তেজিত স্বরে বলেছিলি — 'মাসি, শচীন দেববর্মণ নামে একজন কী অপূর্ব গান করছেন।' তোর সেদিনের গান-পাগল মুখটি আজও আমি ভুলতে পারিনি। এরপর আর তোকে বেঁধে রাখা গেল না। সব কিছু ছেড়ে তুই শচীন দেববর্মণের রেকর্ড যা বার হতো তাই কিনে নাওয়া খাওয়া ভুলে ওর গান শুনতিস। .... তুই শচীনদেব বর্মণকে তোদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনেছিলি। ব্যাস্, এরপর শ্রীরাধিকার প্রেমের টানে ধরা দিলেন কৃষ্ণ শচীন দেববর্মণ।

তোর বিবাহ নিয়ে কতোই না বাদ-বিতণ্ডা। কিন্তু জয়ী হলি তুই, তোর দুর্বার প্রেম। ... তোদের দুজনের প্রেমের মধুর কাহিনী লিখতে গেলে একটি কাব্য হয় রে মীরা। আমি কিন্তু তোর খোঁজ সব সময়ই রাখতাম। শুনেছিলাম শচীনবাবুর জন্য তুই নাকি গান রচনা করতিস। ....

তোর ছেলে হল। সে বড় হল। সে নামী গায়ক হল। সব খবরই রাখতাম, তোকে যে আমি বড় ভালবাসি।

..... মনে জোর করে উঠে দাঁড়া। স্বামী সন্তানকে বুকের মধ্যে রেখে আবার গান রচনা কর, গান কর, নিজের অমূল্য জীবনকাহিনী বসে লেখ। মীরা, আমি চুরাশিতে পা দিলাম। জানিনা আর কখনো তোকে দেখতে পাব কি না। তবে তোর তো কতো কম বয়েস, ভেঙ্গে পড়িস্ না — মনের জোরে উঠে দাঁড়া।

সুন্দর পৃথিবী উপভোগ করে, সবাইকে স্বামী পুত্রের কথা শুনিয়ে যা। আমি যদি চুরাশি বছর বয়সে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, তুই কেন তবে পারবি না? তোর কতো গুণ, বাকি জীবনটাকে সার্থক করে তোল। তোকে দূরের থেকে আমি অনেক আদর, অনেক আশীর্বাদ জানাই। ....

বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে শচীন কর্তার সংগীত পরিচালনা

১৯৩৭ — রাজগী
১৯৪০ — রাজকুমারের নির্বাসন
১৯৪২ — জীবন সঙ্গিনী
১৯৪৩ — ছদ্মবেশী
মাটির ঘর
১৯৪৪ — অভয়ের বিয়ে
জজ সাহেবের নাতনী
অশোক
স্বামী স্ত্রী
১৯৪৬ — শিকারী
এইট ডেজ
দো ভাই
১৯৪৭ — দিল কী রানী
চিতোর বিজয়
১৯৪৮ — বিদ্যা
১৯৪৯ — কমল
শবনম
১৯৫০ — অফসর
মশাল
সমর
প্যার
১৯৫১ — বাজী
বাহার
বুজদিল
একনজর
নও জোয়ান
সাজা
১৯৫২ — জাল
লাল কুনওয়ার
১৯৫৩ — আরমান
বাবলা
জীবনজ্যোতি
শাহনশাহ
১৯৫৪ — অঙ্গার
রাধাকৃষ্ণ
ট্যাক্সি ড্রাইভার
১৯৫৫ — দেবদাস
হাউস নং ৪৪
মদ্‌ভরে নয়ন
মুনীমজী
সোসাইটি
১৯৫৬ — ফানটুশ্
১৯৫৭ — মিস্ ইন্ডিয়া
নও দো গ্যারা
পিয়াসা
পেইংগেষ্ট
১৯৫৮ — চলতি কা নাম গাড়ি
কালাপানি
লাজবন্তী
সিতারোঁ সে আগে
সোলবা সাল
১৯৫৯ — ইনসান জাগ উঠা
কাগজ কে ফুল
সুজাতা
১৯৬০ — আপনা হাত জগন্নাথ
বোম্বাই কা বাবু
বেওয়াকুফ
এক কে বাদ এক
কালাবাজার
মঞ্জিল
মিয়া বিবি রাজি
১৯৬২ — বাত এক রাত কী
ডঃ বিদ্যা
নটি বয়
১৯৬৩ — বন্দিনী
মেরি সুরৎ তেরী আঁখে
তেরে ঘর কে সামনে
১৯৬৪ — বেনজীর
জিদ্দি
ক্যয়সে কহুঁ
১৯৬৫ — গাইড
তিন দেবীয়াঁ
১৯৬৭ — জুয়েল থীফ
১৯৬৯ — আরাধনা
১৯৭০ — জ্যোতি
প্রেমপূজারী
ইশ্‌ক পর জোর নহী
তালাশ
১৯৭১ — শর্মিলী,
চৈতালী(বাংলা)
নয়া জমানা
গ্যাম্বলার
তেরে মেরে সপনে
জিন্দগী জিন্দগী
১৯৭৩ — জুগনু
ছুপা রুস্তম
ফাগুন
অভিমান
অনুরাগ
ইয়ে গুলিস্তাঁ হামারা
উস পার
সাগিনা
১৯৭৪ — প্রেম নগর
চুপকে চুপকে
মিলি
১৯৭৫ — বারুদ
দিওয়ানজী
(একটি গান)

হিন্দুস্থান রেকর্ডের তালিকা

এইচ১১ — ডাকলে কোকিল
এই পথে আজ এস
এইচ২১ — বধু এলো মধুরাতে
তুমি তো বঁধু এলে না
এইচ৫১ — ও কালো মেঘ বলতে
এই কাননের ফুল নিয়ে
এইচ১২০ — স্বপন না ভাঙে। যদি
আজ রাতে কে
এইচ১৩৭ — যদি দখিনা পবন
আলো ছায়া দোলা
এইচ১৩৯ — ঝুলনে ঝুলিছে শ্যামরায়
রইব না আর উজান
এইচ১৯৮ — প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে,
মন দুখে মরিরে
২২৪ — কণ্ঠে তোমার দুলবে
এই মহুয়া বনে
২৬৬ — ওরে সুজন নাইয়া
নিশীথে যাইও
২৯৩ — স্বপনে দেখেছে গিরিরানী
বিদায় দাওগো মোরে
৩০৫ — তুমি নি আমার বন্ধু
বন্ধু বাঁশী দাও মোর
৩৩৪ — বল বল বল বধূ
জাগার সাথী মম
৪১২ — মম মন্দির এলে কে
নতুন ফাগুন যবে
৫২৫ — তোমারি সাথে সুরে
পরদেশে কেন গো
৫৮৮ — ওরে বন্ধুরে মনের কথা
সাজে নওল কিশোর
৬১৪ — তুমি যে ছিলে মোর
জাগো মম সহেলী
৬৫৮ — তুমি যে গিয়েছ
প্রেম যমুনায়
৭০৬ — চম্পক জাগো
কাঁদিব না ফাগুন গেলে
৭৩০ — মেঘ ঝরে যায়
ছিল মাধবী রাতি গো
৭৫০ — বুঝি আমার প্রাণ যায়
আমার মিলন মালাটি
৮৩১ — প্রেমের সমাধিতীরে
আমি ছিনু একা
৮৫৭ — কুহু কুহু কোয়েলিয়া
মেঘলা নিশি ভোরে
৮৮৯ — প্রিয়া আজো নয়
গোধূলির ছায়া পথে
৯২২ — তাজমহল
চলো চলো
৯৩০ — অবোধ মেয়ে
কি মায়া লাগলো চোখে
৯৪৬ — বাঁশরীয়া রে
আমার কি হলো
৯৬৯ — চোখ গেল চোখ গেল
পদ্মার ঢেউ রে
৯৯৮ — উদাসীরে বিদেশীরে
কে যেন কাঁদিছে
৯৯৭ — মলয়া চল ধীরে
কোকিলারে গেও না
১০০১— ধীরেসে যানা বাগিয়ানমে
কোন্ নগরিয়া যাওরে
১০১৫— জনম দুখিনী সীতা
বাংলার মেয়ে
১০৪৬— কথা দাও, দাও সাড়া
মধু বৃন্দাবনে
১০৫৫ — যবে অলকের ফুল
ফিরে গেছি বারে বারে
১০৬৮ — বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা
নতুন উষার সৈনিক
১০৮৬ — কাল সাগরের
শ্যামরূপ ধরিয়া
১০৯৪ — পীলে পীলে
শ্যাম শুনো মেরে
১০৯৯ — ললিতা মরমী
পিয়া সনে মিলন পিয়াস
১০৪৫১ — ফুলের বনে যাক ভ্রমর
কে যাবি বল বৃন্দাবনে
১১৪৬১ — নয়ন মোর
প্রীতমে হয়ে বদনাম
১১৪৯৪ — ঝন ঝন ঝন মঞ্জীর
পোহালো রাতি জাগিয়া
৫৪৮ — অব মৈ শরণ তুমারী
মেরে প্রীতম পেয়ারে
৫৫৩ — গৌররূপ দেখিয়া হয়েছি
পিঞ্জরায় পাখীর মত
১১২১৯ — রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে
তুমি কি শ্যামের বাঁশি
১১১১৬০ — প্রিয় রজনীগন্ধাবনে
ধিক ধিক তোর এজীবনে
১১৭৯ — বালম্ মুঝসে রুঠকে
মেরে যৌবন কি
১২০১ — ভুলায়ে আমায় দুদিন
কে আমারে পিছু ডাকে
১২১১ — রিম ঝিম রিম ঝিম
নয়না কা
১২১৬ — গায় যে পাপিয়া
আজ দোল দিল কে
১২৩১ — ফুল গেঁদুয়া না মারো
তুম হে বড়ে চিত্‌চোর
১২৯৯ — কেন আলেয়ারে বন্ধু ভাবি
বঁধুগো এই মধুমাস
১৩২০ — গুণধাম আমাদের
নীরবে আঁখি জলে ভরে
১৩২১ — গুনধাম আমাদের
দেশকী জনতা তুমহে
১৩২৮ — এই চৈতী সন্ধ্যা যায় বৃথা
কেন হায় স্বজন ভাঙ্গায়
১৩৪০ — প্রেম যমুনায় হয়ত কেউ
হায় কি যে করি
১৩৪৮ — বাঁশী তোমার হাতে
কে দিল ঘুম ভাঙ্গায়ে
১৪৩৮ — মরমিয়া রে উদাস
বাসরের ফুল গেল যে
১৭৯ — রইব না আর উজান ঘরে
ঝুলনে ঝুলিছে শ্যামরায়
১৩২৬ — কেন হায় স্বপন ভাঙ্গার আগে
এই চৈতি সন্ধ্যা যায়

এইচ এম. ভি রেকর্ডের তালিকা

৪৫ এন ৮৩৫৪৩ — সেকি আমার দুশমন দুশমন
কি করি আমি কি করি
৭ ই পি ই ১০৮৭ — গানের কলি সুরের ডুরিতে
সুবলরে বলো বলো
শোন গো দখিনা হাওয়া
বর্ণে গন্ধে ছন্দে
৭ ই পি ই ১১২৮ — বিরহ বড় ভাল লাগে
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙা
রাতের আতরে ভিড়াইয়া
কালসাপে দংশে আমায়
ই সি এল পি ২২২৮ — বাজে না বাঁশি গো
আমি পথ চেয়ে রব
মালাখানি ছিল হাতে
আঁখি দুটি ঝরে হায়
আজো আকাশেরও পথ
শ্রীমতী যে কাঁদে
মন দিল না

তুমি আর নেই সে তুমি
সেই যে দিনগুলি
ঝিলমিল ঝিলমিল
বাঁশি শুনে আর
ও জানি ভোমরা
ই স এল পি ২৩২৭ — তুমি যে গিয়াছ
যদি দখিনা পবন
তুমি তো বধু জানো
কাঁদিবে না ফাগুন গেলে
প্রেম যমুনার পারে
প্রেমের সমাধি তীরে
আলোছায়া দোলা
নিশীথে যাইও ফুলবনে
মধু বৃন্দাবনে
রঙ্গিলারে
ঝন ঝন মঞ্জীর বাজে
আমি ছিনু একা
৪৫ এন ৮৩৪৯৮ — না আমারে শশী চেয়ো না

রাধার ভাবে কালা হইলা গোরা
তাকডুম তাকডুম
কে যাস রে ভাটিগাঙ গাইয়া
পি ১১৯৩৩ — কথা দিয়ে এলে না
ফুটে নারে ফুল
পি ১১৯০৪ — বাজে না বাঁশি গো
আমি পথ চেয়ে
পি ১১৯৩২ — ঘুম ভুলেছি নিঝুম
ও জানি ভোমরা কেন।
পি ১১৯৪৮ — সইতে পারি না বলা
বনে ফাগুন মনে আগুন
এন ৮৩২৪৮ — অসময়ে বাজাও বাশি
মনে কিছু করো না ।
এন ৮৩১৪২ — কেন সে যে হায়
যে না জানে বিরহের মানে

সুরাজ শ্রুতিসদনের সৌজন্যে

পান থেকে পাবনা

বেঁচে থাকলে গত ১১ নভেম্বর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র বয়েস হত নব্বই। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের সেই আশ্চর্য মায়াবী 'পাবনা।' এই পাবনা জেলার মধ্যেই 'শিতলাই'। সেখানকার জমিদার ছিলেন মৈত্ররা। ১৯১১তে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র জন্ম এই পাবনার শিতলাইয়ের মৈত্র পরিবারে। ছোটবেলাটা কেটেছে একদিকে পরিবারের আভিজাত্য-মোড়া শাস্ত্রীয় সংগীত আর রবীন্দ্রনাথের গানে, আরেকদিকে পদ্মার মাঝি-মাল্লা আর মেঠোপথের আউল বাউলদের লোক-সুরের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে যেতেন তখন বোট চেয়ে পাঠাতেন পড়শি জমিদার শিতলাইয়ের মৈত্রদের কাছে। রবীন্দ্রনাথের অতিনিকট সান্নিধ্য জ্যোতিরিন্দ্র পেয়েছেন খুব ছোট্টবেলা থেকেই।

আবাল্য শিল্প সাহিত্য সংগীতের মধ্যে যিনি বড় হয়েছেন, কৈশোর শেষে সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের কৃতী ছাত্র হয়েও তিনি যে মাঝপথে মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। হয়েছিলও তাই। কিন্তু গোল বাধল, নিজের জীবনচর্যায় এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা নিয়েই। 'নবজীবনের গান' তৈরির ল্যাবরেটারিতে যাওয়ার আগে জ্যোতিরিন্দ্রর গোলমেলে আপাত অস্বাভাবিক জীবনচর্যার একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে নিই। গল্পটা শুনেছিলাম ওঁর অনুজপ্রতিম বন্ধু কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিট। বাড়িটা তখন তাবড় তাবড় লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের সন্ধেবেলা দেখা সাক্ষাতের ঠিকানা। এখানেই দেবব্রত বিশ্বাস, শম্ভু মিত্র, বিষ্ণু দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রসাদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, চিন্মোহন সেহানবিশ, তৃপ্তি ভাদুড়ি (পরে মিত্র) প্রমুখের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্ররও নিত্য আনাগোনা বিকেল হলেই গুটিগুটি চলে আসা। তারপর গান নাটক কবিতার রিহার্সাল । কখনও কখনও জমাট তর্ক বিতর্ক। আবার মাঝে মাঝে শুধুই আড্ডা। রাত ১১টা বাজলে টালিগঞ্জের শেষ ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে দল বেঁধে উঠে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরে আসা। রুটিনটা এরকমই। একদিন হল কী, জ্যোতিরিন্দ্র রোজকার মতো বন্ধুদের 'একটু দাঁড়াও, পান কিনে আনি' বলে রাস্তা পেরিয়েছেন। তারপর আর দেখা নেই। পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট ছাড়িয়ে অপেক্ষা যখন ঘন্টায় দাঁড়িয়েছে তখনও জ্যোতিরিন্দ্রর দেখা নেই। বন্ধুরা বুঝেছেন বাড়ি চলে গেছে। স্বভাবতই বিরক্ত হয়েছেন সকলে। শেষ ট্রামটা হয়তো আর পাওয়া যাবে না। পরের দিন খুব ভোরে জ্যোতিরিন্দ্রর ভাই রথীন্দ্র মৈত্র (পরবর্তী কালে খ্যাতকীর্তি চিত্রকর এক বন্ধুর বাড়ি গেছেন দাদার খোঁজে। বন্ধু তো অবাক। সেখান থেকে বন্ধুকে নিয়ে ভাই চললেন আরেক বন্ধুর বাড়ি। একটা ছোটখাটো বন্ধুদের দল তৈরি হল। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও জ্যোতিরিন্দ্রকে পাওয়া গেল না। দিন পাঁচেক পর আবার ৪৬ নম্বরে হাজির জ্যোতিরিন্দ্র। 'আত্মীয় বন্ধুদের দীর্ঘ উৎকণ্ঠায় ফেলে এতদিন কোথায় ছিলে?' একগাল হেসে সরল উত্তর, 'পাবনা গিয়েছিলাম'। বন্ধুরা হতবাক। 'গেলে তো পান কিনতে। তারপর....?' একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, বলল, পাবনা যাচ্ছে। ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। বলে যাবার মত সময় হাতে ছিল না। তাই পান কিনতে গিয়ে পাবনা—এই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। কাঁধে ঝোলা আপন ভোলা এক স্বভাব কবি। ১৯৪৩ সাল, বাংলার ১৩৫০। দেশজোড়া আকাল। মন্বন্তরের সেই কালো ছায়ায় জ্যোতিরিন্দ্র লিখছেন—

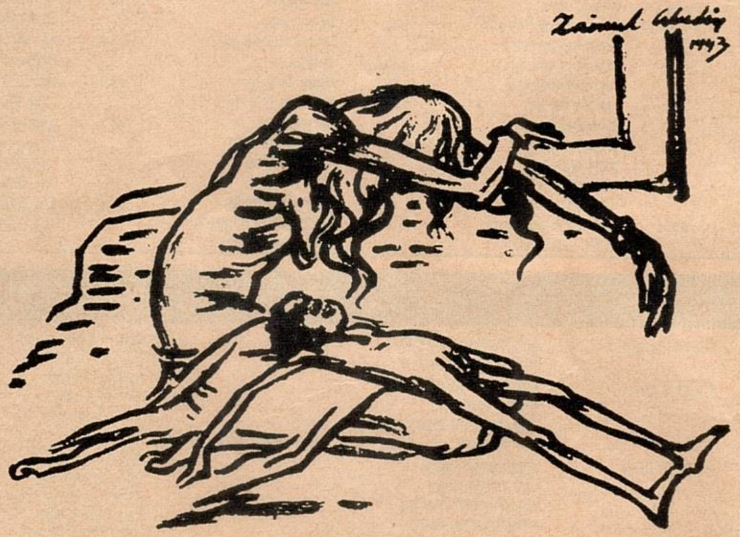

'একদিন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেঁচকি তুলে কাঁদছে।

এর প্রচণ্ড অভিঘাত আমার গোটা অস্তিত্বকেই কাঁপিয়ে দিল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, না না না।

অস্থির পায়ে দৌড়তে দৌড়তে হেঁটে চলেছি আর মনে মনে বলছি We wo'nt allow people to die. মানুষের তৈরি এ দুর্ভিক্ষ মানবো না, প্রতিরোধ করব, উত্তীর্ণ হব। হাত মুঠো করে বলে উঠলাম— না না না।

এই হল শুরু, মনে নেই কার বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিলাম, কার কাগজ ধার করে কার কলমে লিখলাম। সুর আর কথা মনের বেদনা ও যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎসমুখ থেকে ঝর্ণার মতো বেরিয়ে এল। শুরু হল নবজীবনের গান—

না না না
মানবো না মানবো না ।
কোটি মৃত্যুরে কিনে নেবো
প্রাণ পণে
ভয়ের রাজ্যে থাকবো না ......

এই প্রতিবাদ আমাকে নিয়ে এল মানুষের জীবন সংঘর্ষের পাশাপাশি। হয়ে গেলাম তাদের সহযাত্রী— সংগ্রামী কবি, সুরকার-গায়ক।

(আমাদের নবজীবনের গান)

নবজীবনের গান। সূচনা পর্বের এটাই ইতিহাস। দুটো পর্বে বিভক্ত তেত্রিশটি গানের একটা সিরিজ এই নবজীবনের গান। গাওয়া হত গায়ক গায়িকাদের প্রথম দল, দ্বিতীয় দল, তৃতীয় দল ও শৌখিনদের দল এরকমভাবে ভাগ করে নিয়ে। কখনও সবাই একসঙ্গে আবার কখনও একটি বা দুটি দল আলাদা আলাদা মঞ্চে এসে অপেরার ঢঙে। গণনাট্য সংঘের সেই স্বর্ণযুগে এ গান গাওয়া হত শহর নগর বন্দর ছাড়িয়ে গ্রামগ্রামান্তরে। সময় বদলে গেছে। দেশভাগ স্বাধীনতা, উপমহাদেশের অস্থিরতা, রাষ্ট্রীয় পালাবদল থেকে তৈরি হওয়া নিত্য নতুন সমস্যায় ফিকে হয়ে গেছে আকালের স্মৃতি। বাংলা গানের ইতিহাসচর্চায় নবজীবনের গান একটা মিথ্ হয়ে গেছে।

নবজীবনের গানের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই একালের মানুষের বিশেষ করে যারা জন্মেছি পঞ্চাশের পরে। জ্যোতিরিন্দ্রর যে-কাজের সঙ্গে

অনন্য একক

আড়াই দশক আগে চলে গেছেন মানুষটি। কিন্তু আজও কী অমোঘ তাঁর উপস্থিতি! সময় এতটুকু বিবর্ণ করতে পারেনি তাঁকে। জীবনমুখী জোয়ার কিংবা বিশ্বায়নের ঘূর্ণির মধ্যেও অটল দাঁড়িয়ে এক মহীরুহ। কী মন্ত্রে, কোন জাদুতে - তারই উত্তর খুঁজেছেন শ্যামল চক্রবর্তী।

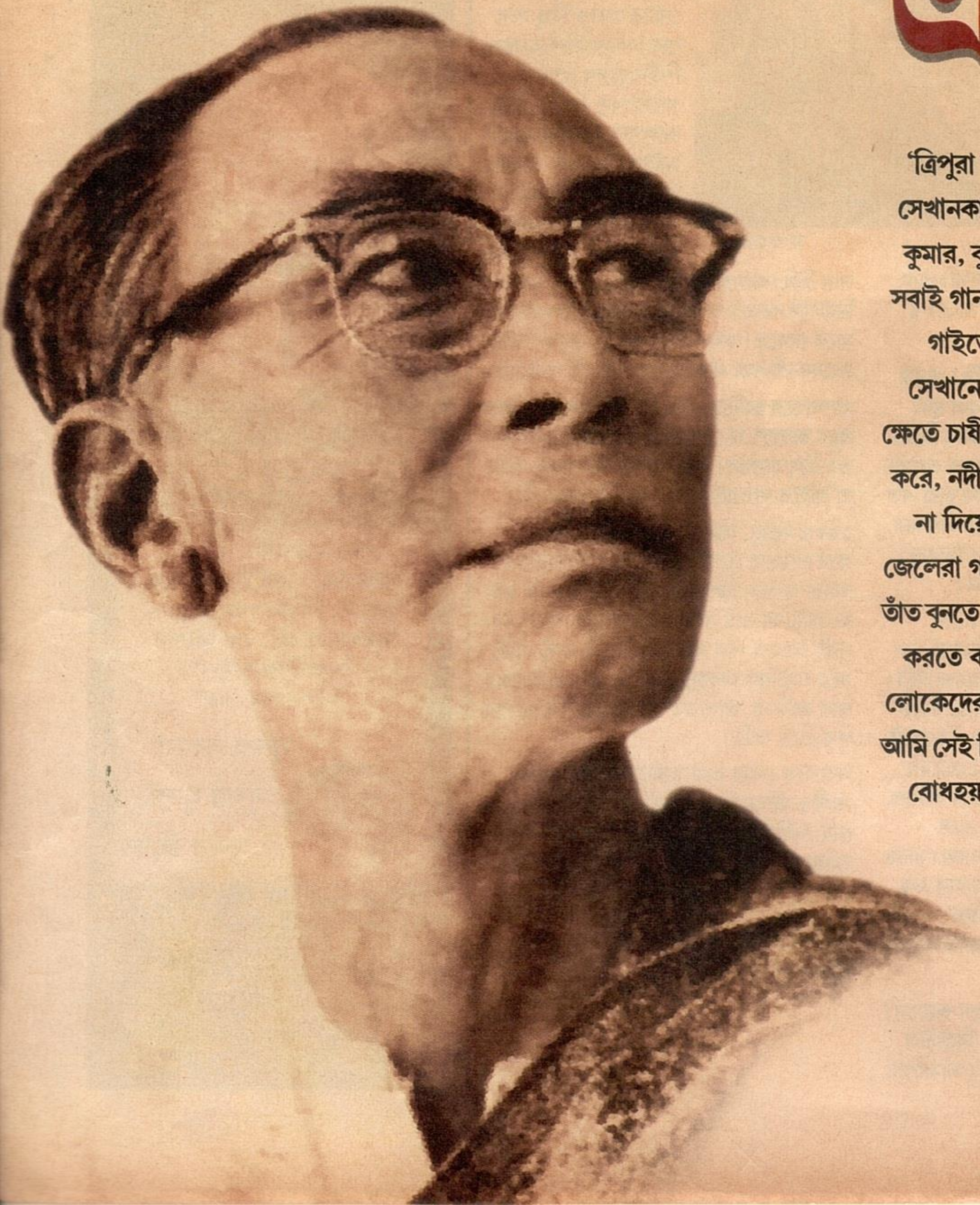

‘ত্রিপুরা সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে, সেখানকার রাজবাড়িতে রাজা, রানী, কুমার, কুমারী থেকে দাসদাসী পর্যন্ত সবাই গান গায়। গলায় সুর নেই, গান গাইতে পারে না এমন কেউ নাকি সেখানে জন্মায় না। ত্রিপুরার ধানের ক্ষেতে চাষীরা গান গাইতে গাইতে চাষ করে, নদীর জলে মাঝিরা গানের টান না দিয়ে নৌকো চালাতে জানে না, জেলেরা গান গেয়ে মাছ ধরে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে আর মজুরেরা পরিশ্রম করতে করতে গান গায়। সেখানকার লোকেদের গানের গলা ভগবানপ্রদত্ত। আমি সেই ত্রিপুরার মাটির মানুষ— তাই বোধহয় আমার জীবনটাও শুধু গান গেয়ে কেটে গেল।’